"... were we led all that way for
Birth or Death?"

—T. S. Eliot.

JALABIMBA

a Novel

by Chitta Sinha

প্রহরে প্রহরে পরিবর্তিত অতি নাটকীয় কোন অবাস্তব কাহিনীর নয়, শুধুমাত্র একটি যুবক ও একটি যুবতীর গতানুগতিক মন দেয়া-নেয়ার মনোহরণ চটুল ঘটনার নয়; এ কাহিনী, —বিচিত্র তরঙ্গে, তরঙ্গ-ভঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে উদ্দাম এক দ্রুত ধাবমান কালের। যে-কাল প্রতিটি মানুষ-মানুষীর আপন অস্তিত্ব রক্ষার নিদারুণ সংগ্রামে নিরন্তর বিপর্যস্ত, মূল্যবোধের মহৎ প্রশ্নে নিয়ত বিভ্রান্ত, এবং চতুর্দিকের বহুবর্ণ কোলাহল প্রতিক্ষণে দিকভ্রষ্ট।

এই উদভ্রান্ত কালের কথা অনন্যসাধারণ কুশলতায় লিপিবন্ধ করেছেন চিত্ত সিংহ, বিরল নৈপুণ্যে গ্রন্থি মোচন করেছেন অপরিমিত জটিলতার।

জলবিম্ব'-এর নায়ক শুভ ও নায়িকা ঋতু, শুধুমাত্র নায়ক-নায়িকা নয়, মিলিতভাবে সর্বগ্রাসী একমুখ আগুনের দিকে ধাবমান একটি কাল।

এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :

বেহুলা

ঈশ্বর পাটনী

জতুগৃহ

নিষাদ

জলবিম্ব | চিত্ত সিংহ

সৃজনী
৪ ভূপেন বোস এভিনু্য, কলিকাতা ৭০০০০৪, ৫৫-৪৬১৬

রচনাকাল ঃ
জুলাই ১৯৫৯—জানুয়ারী ১৯৬১

প্রচ্ছদ ঃ চিত্ত সিংহ
সহায়তায় : কমল তপাদার

প্রকাশক ঃ
চন্দন চৌধুরী
সুজনী, ৪ ভূপেন বোস এভিন্যু, কলিকাতা-৪

মুদ্রক ঃ
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস, ১, রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদ মুদ্রক ঃ
দিলীপ ভৌমিক

প্রথম সংস্করণ/১৯৬১
দ্বিতীয় সংস্করণ/জুন ১৯৬৪

রীতুকে

ঋতুর সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। সেই দীর্ঘদিনের পরিচয়ের কোথাও ভালবাসা ছিল না, প্রীতি না, মমতাও নয়। যেটুকু ছিল তা নেহাতই আত্মীয়তা। এই আত্মীয়তার সুবাদে কখনো দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, কখনো বা ক্ষণকয়েকের গল্পগুজব। সে সামান্যই।

সেবারের বসন্তে, যদিও আমি বিকেল ভ্রমণে অভ্যস্থ নই, কোন পার্কে অথবা ময়দানে, সে তুমি জানো, তবু কি খেয়ালে জানি নে, একদিন পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সে যাওয়া নেহাতই যাওয়া। হয়ত বা কোথাও যাবার ছিল না, নয়ত আমি তখন স্বভাব-গুণে আমার তথাকথিত বন্ধুদের বিরক্তির কারণ হয়ে পড়েছিলাম। এবং, সেখানে যে কোনো চেনা মুখের খোঁজে যাই নি, এ আমি হলপ করে বলতে পারি। আসলে গিয়েছিলাম, শুধুই সময় কাটানোর জন্যে। সেখানেই হঠাৎ ঋতুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমার।

বলাবাহুল্য, সেবারের বসন্ত এ শহরে বেশ সমারোহের সঙ্গেই জমে বসেছিল। অবশ্য আগে সে সব লক্ষ্য করার মত অবকাশ আমার ছিল না, ফলে বসন্তের সমস্ত চমক হঠাৎ সেদিনই আমার চোখ ঝলসে দিল। প্রচুর হাওয়া আমাকে বিব্রত করল সহস্র চুমোয়, অবারিত সবুজ আমার দৃষ্টিকে করল স্নিগ্ধ। শহরের নিত্য-নৈমিত্তিক কোলাহল কখন জানি নে পাখীদের বিচিত্র কলরবের তলায় একেবারে ডুবে গেল।

আমি আর ঋতু পাশাপাশি ঘাসের উপর বসেছিলাম। ঘাসফুল আমাদের হাতের কাছে, পায়ের কাছে বার বার আদর কাড়তে উন্মুখ হয়ে ছিল। আমরা কথার ফাঁকে ফাঁকে অনায়াসে বিলি কেটেছিলাম ঘাসের চুলে, ফুলে।

সেদিন অনেক কথা হয়েছিল আমাদের। ওর স্বামীর কথা, ওর নিজের কথা, আমার কথা। কথার ফাঁকে ফাঁকে আমার বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় নি যে, ঋতুও আমার মতোই নিঃসঙ্গ। সংসার, স্বামী, পুত্র—সবই আছে, তবু কোথায় যেন তার একটা গূঢ় ক্ষত আছে। আর সেই ক্ষতের রক্তক্ষরণ আলাপের ফাঁকে ফাঁকেই অনুভব করেছিলাম। সেও জানত, আমার সমস্ত মনোভঙ্গীর

গভীরের সেই নিগূঢ় দীনতার কথা, যার জন্যে আমি সারাক্ষণ উন্দাম হয়ে ছুটে বেড়াতাম। সে আমার প্রসঙ্গে যখন এল, তখন, সে নির্দ্বিধায় আমার দৈন্যের মুখ খুলে ধরল। বলল, এভাবে আর কতদিন ঘুরে বেড়াবে?
জবাব আমার সঠিক জানা ছিল না বলে আমি চুপ করে ছিলাম। সে আর সে-কথা না বাড়িয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল, তোমার ত প্রতিদিনই রোববার, না?
আমি হেসেছিলাম।
সে জিজ্ঞেস করল, দুপুরে কি কর?
ঋতুর দিকে না তাকিয়েই বললাম, ঘুমোই।
ঘুমোও? অত ঘুমোতেও পার? ঋতু যেন আকাশ থেকে পড়ল।
জিজ্ঞেস করলাম, কি করব?
ঋতু কি যেন ভেবে বলল, কাজ করার ত দরকারই হয় না। একটু থেমে যোগ করল, করবেও বা কি? একেবারে কুঁড়ের বাদশা!
আমি হাসলাম।
ঋতু বলল, চল না কাল দুজনে সিনেমায় যাই।
আমি একটু ইতঃস্তত করে রাজী হয়েছিলাম। ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি তখনো ঋতুকে আমি ভালোবাসি নি। ভালোবাসার কথা ভাবি নি।

পরের দিন কোন্ সিনেমায় কি বই দেখেছিলাম কে জানে? অবশ্য হলে দুজনেই ঢুকেছিলাম। আমাদের সামনের পর্দায় অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছিল সত্যি, কিন্তু আমি তার কিছুই বুঝতে চাই নি। শুধু বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, ঋতুর যে হাতটা আমার হাতে আলতো চাপ দিচ্ছিল তার ভাষা, যা তখনো অস্বাভাবিক কাঁপুনিতে অস্পষ্ট, এবং জড়ানো। আমি ভাল বুঝি নি। শো শেষে শুধু চা খাবার জন্যে যখন রেস্তোঁরার কেবিনে গিয়ে বসলাম, তখন বয়কে শুধু চা না বলে আমি আরো কিছু বলেছিলাম, যা মেনুর মধ্যে সবচেয়ে দামী। কিন্তু সব চাইতে দুঃখের বিষয়, সে-সবের কিছুই আমরা খাই নি, খেতে পারি নি, কারণ আমরা উভয়েই তখন ভীষণ উত্তেজিত। এবং সেই উত্তেজনার আশু প্রশমনের জন্যে, যতদূর মনে পড়ে আমি ঋতুকে আচমকা চুমু খেয়েছিলাম। আর তাতেই ঋতু প্রথমে একেবারে নেতিয়ে পড়ল, তারপর যখন তার ক্লান্তি কাটল, তখন, সে আমার হাত দুটো তার হাতে নিয়ে চোখে চোখ রেখে অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করল, ভুলে যাবে না তো?

আমার ভীষণ হাসি পেয়েছিল এবং হেসেই বলেছিলাম, কি করে বলি।
ও হাত ছেড়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলেছিল, জানতাম।
কি?
সে জবাব দেয় নি। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করেছিল, আর আমাদের দেখা হবে না?
কি ভেবে আমি ঠিক জানি নে, বলেছিলাম, তা কেন, আগামীকাল আমার বাসায় এসো।
কখন?
এই বিকেলে।
তারপরই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। যাবার আগে অনেকক্ষণ সে আমার দিকে অপলক তাকিয়েছিল। ভোরের সূর্যমুখী যেভাবে সূর্যের দিকে তাকায়, সে ভাবেই। তার দৃষ্টি ছিল ভীষণ ভেজা, আমি খুব খুসি হয়েছিলাম।

পরদিন প্রথমে বুঝতে পারি নি কেন আমি কিছুই করতে পারছি নে। কোন কাজ না, ভাবনা না, এমন কি যে বই-পড়ার নেশা আমার মজ্জায় মিশেছিল তাও না। আমি এক অস্বাভাবিক অস্থিরতায় উঠছিলাম কখনো, বসছিলাম, কখনো বা গভীর মনোযোগ দিয়ে বই পড়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই মন বসছিল না। আমি কি ঋতুর কথা ভাবছিলাম? আজ বিকেলে তার আসার কথা? হ্যাঁ, তাই। এবং সে ভাবনাতেই আমি উঠেছি, বসেছি, ছুটেছি। আর বার বার তাকিয়েছি সূর্যের দিকে, জানালা ডিঙিয়ে আসা রোদের দিকে। কখন এই রোদের শরীর ক্রমশঃ ছোট হতে হতে ঘরের মেঝে থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং আমার ঘরের দেয়াল বেয়ে দ্রুত ছোট কাঠবেড়ালীর মত চালার ওপর থমকে স্থির হয়ে থাকবে। আর দেখছিলাম, দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা, কখন আচমকা বিকেলের ঘণ্টার দড়িতে হাত দিয়ে মৃদু হেসে কলরব করে উঠবে। সেদিনের সে বিকেল বড্ড দেরিতে এসেছিল, অবশ্য ঋতুকে সঙ্গে করেই এনেছিল।
ঋতু আসার আগে আমি অজস্রবার ঋতুর আসা-পথের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত নিষ্পলক তাকিয়েছি, তখন পাখীর গান ভাল লাগে নি, দক্ষিণের বাতাসে বিরক্ত হয়েছি, এবং শহরের কোলাহল আমাকে বার বার যন্ত্রণা

দিয়েছে। তারপর যখন ঋতুকে অনেক দূরে আসতে দেখলাম, যখন সে দ্রুত এগিয়ে আসছে আমি স্পষ্ট দেখলাম, তখন ঈশ্বর জানেন, আমার শরীর উত্তেজনায় আশঙ্কায় এবং কী ভীষণ এক ভয়ে জানি নে, থর থর করে কাঁপছিল। সে মুহূর্তে ঈশ্বরের কাছে বার বার প্রার্থনা করেছি, বলেছি— ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ও ফিরে যাক, ও না আসুক।

ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শোনেন নি। ঋতু এসে ঘরে ঢুকল। আমার মনে হল, বহুবার মনে হল—না, তার আগে আমার কাঁপুনি একেবারে থেমে গেল। আমি তখন স্থির, গম্ভীর। আমি ঋতুর দিকে অপলক তাকিয়ে আছি, ঋতু কিন্তু আমার দিকে না তাকিয়েই হাসতে হাসতে বসে পড়ল আমার খাটে। সে ভয়হীন, সে আশ্চর্য সহজ, এবং স্বচ্ছন্দ। আর আমি, মনে মনে ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি ঋতু আমার ঘরে আসার জন্যে, আমার খাটে বসার জন্যে। কিন্তু খুসি হয়েছি সে ভাবটা একেবারে আড়াল করে বললাম, তাহলে তুমি এলে ?

ঋতু হাসল। একটুও অপ্রস্তুত হল না।

তারপর দুজনে পাশাপাশি, কাছাকাছি। কী ভীষণ নির্জনতা চতুর্দিকে। কেউ নেই, কিছু না, শুধু আমি আর ঋতু, ঋতু আর আমি। তখন সময় যেন স্থির, দিন-রাত্রি যেন স্থির, পৃথিবী-গ্রহ-নক্ষত্র সব যেন স্থির, স্থির বুঝি আমরাও। এভাবে কতক্ষণ, কতক্ষণ ? জানি নে।

অনেক পরে বুঝতে পারলাম কিছুই স্থির নয়। সময় নয়, পৃথিবী নয়, দিন রাত্রি এমন কি ঋতু, আমিও নই।

এর পর অনেকগুলো দিন। অনেকগুলো মাস। আমি ঋতুকে ভালবাসলাম। সে যে কী সর্বগ্রাসী ভালবাসা আমি জানি নে। শুধু জানতাম আমার সব চাই, ঋতুর সব কিছুই। তার দেহ, তার মন, তার ভালবাসা।

ঋতু হঠাৎ সেই আশ্চর্য পিদিমটাকে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল।

আলো নিবলেই অন্ধকার। ঋতু সে অন্ধকার। আমিও।

দোহাই তোমার, বৃথা তর্ক করো না। তুমি যা ভাবছ তা আমি জানি, তুমি কি বলবে তাও। ঘুরিয়ে বলবে, আলোহীনতাই অন্ধকার—এই ত! সে অন্ধকার আমি চিনি। তার সাথে আমার পরিচয় আছে। সে এ নয়।

ঋতু যা আমার কাছে, আমার কাছে আমি যা, সে অন্য। এ হল ফুঁ দিয়ে হঠাৎ আলো নেবানো অন্ধকার। এ অন্ধকারের কোন আলো নেই, এ কালো ভীষণ কালো। এ কুৎসিত, এবং নির্জন, নিঃসাড়ও বলতে পার, ঠাণ্ডাও। না, সবচেয়ে ভাল হয়, যদি বল—মৃত।

ঋতু আমাকে হারাবার জন্যে এ অন্ধকার সৃষ্টি করেছিল।

সে পেরেছে।

আমি হারিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, পারি নি। আমি মরেছি।

আমিও মৃত।

মৃত্যু তোমার পরিচিত। মৃত্যুকে সবাই চেনে। সে ঘরে-বাইরে, দেহের ছায়ার মতো, সারাক্ষণের সঙ্গী। কিন্তু মৃতের কাছাকাছি এসেছ কখনো? পাশাপাশি বসেছ? সখ্যতা পেতেছ কোন দুর্বলতম মুহূর্তে?

না!

কি আশ্চর্য! আমাকে তাহলে তুমি বোঝ নি। বুঝতে পার নি। যার সঙ্গে তুমি ট্যাক্সিতে ঘুরেছ, কাফেতে বসেছ যার মুখোমুখি, যার হাতে হাত রেখে বলেছ বন্ধু, যে তোমাকে স্বল্প পরিচয়ের সুযোগে অনেক গম্ভীর এবং ভারী কথা অনর্গল বলেছে, বিশ্বাস করো, সে-তাকে আমিও ঠিক ঠিক চিনি নে। সে ছদ্মবেশী, আমার অচেনা, সে আমি নই। ঋতুও তাকে চিনত না। অথচ সে যাকে চিনেছিল, যে মৃত নয়, যে সত্যই আমি, ঋতুর চোখে তার অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না। সে এত অগভীর, এত নগণ্য যে, ঋতু তাকে কোন খাতিরই করে নি। ঋতু সেখানেই ভুল করেছিল। ঋতু তাই ঠকেছে, এবং আমাকেও ঠকিয়েছে।

আমি ঠকেছি, যেহেতু আমি ঋতুর সব-ই চেয়েছিলাম। ঋতু দেবে বলে আমাকে কিছুই দেয় নি, স্পর্শ ছাড়া। অথচ আমি তাকে সবই দিতে চেয়েছিলাম, স্পর্শের অনেক অনেক বেশী, আমার সর্বস্ব। ঋতু নিতে পারে নি, নেয় নি। ঋতু ঠকেছে।

ঋতু রক্ষণশীলা। ঋতু কুসংস্কারাচ্ছন্না। ঋতু অন্ধকার। আমার মতই অন্ধকার। এবং—

ঋতু অশিক্ষিতা। আমিও।

আমরা ভগবানে বিশ্বাস করতাম, অদৃষ্টেও। আমরা ভীরু।

অথচ ঋতুর মেয়ের বয়স তিন। এই বয়সেই ঋতুর মেয়ে পাউডার মাখে, ফ্রক বদলায় দিনে বার সাতেক, ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে ঠোঁট রাঙায়।

ঋতু, তিন বছর বয়সে পাউডারই দেখে নি। সাত বছর পরেও ঋতুর মেয়ে ঋতুর মতো হবে না।

ঋতুর ছেলেও নয়। ঋতুর ছেলের বয়স আট। বিয়ের দু বছর পরেই ছেলেটি হয়। ঋতুর ছেলে আমাকে মামা বলে ডাকে, অথচ আমি সম্পর্কে দাদা। ধমক দিলে সে আরও বেশী করে ডাকে। ঋতু হাসে। ন্যাকামি করে বলে, ছেলেটা ভীষণ দুষ্টু হয়েছে, না? ঠিক তোমার মতো। ধমকে-ধামকেও থামান যায় না।

আমাকে কি সত্যই থামান যায় না? ঋতু কি থামিয়ে দিতে পারে নি? আমি বিস্ময়ে চোখ তুললাম। ঋতু মিষ্টি করে চোখ টিপল।

ঋতু আমাকে ভালবাসে। ওর ছেলেমেয়েকেও বাসে। ওর স্বামীকেও।

ঋতুর ভালবাসা অফুরন্ত।

ঋতুর দুটি মরেছে। একটি পেটে, আর একটি দুবছর বয়সে। না মরলে ঋতুর চারটি হত। ঋতুর মায়ের এগারোটি। একটিও মরে নি।

ঋতু কিন্তু আর চায় না। কেন চায় না, ঋতু সে কথা স্পষ্ট করে নি। করতে পারে নি। অথচ আমি জানি, ঋতু যে ক'টি চিঠি আমাকে লিখেছিল তাতেই জেনেছি, ঋতুর মা ঋতুর চেয়ে খুব খারাপ চিঠি লিখত না। তবু ঋতু, ঋতুর মার মতো নয়।

ঋতুর মা সাজতে জানে না। ঋতু জানে।

সে যখন সাজত তখন তার পাশে আমাকে কিছুতেই মানাত না। ওর বরকে মানাত। সে সুপুরুষ, ঋতু তন্বী।

ঋতু সুন্দরী। ঋতু লতার মতো।

ঋতুর শরীরের লাবণ্য ঋতু ধরে রেখেছিল। সে বোকা নয়, তার মার মতো সেকেলেও নয়। সে একেলে, সে চতুরা।

চতুরা ঋতু আমাকে টানে।

ঋতুর ছেলেমেয়েরা তবুও রোগা নয়। বেশ ভাল স্বাস্থ্য ওদের। অথচ ঋতুর ভাইবোনগুলো রোগা, বিশ্রী।

ঋতু আমাকে পাগল করে।

ঋতু আমাকে পাগল বলত, মাঝে মাঝে ছেলেমানুষ।

আমি ছেলেমানুষী করতাম। পাগল সাজতাম। এ-সব সে পছন্দ করত ; খুশি হত।

তাকে খুশি করার জন্যেই আমি এলোপাতাড়ি চুমু খেতাম, সেও খেতো। কী স্বাদ পেতো কে জানে, প্রতিটি চুমুর পরে সে কেমন এক ক্লান্ত, শ্রান্ত ভঙ্গিতে নেতিয়ে পড়ত, মুখটা আড়াল করত, মাথাটা ঝুঁকে থাকত কাঁধের পাশে। মনে হতো যেন এতেই তার কতকিছু খাওয়া হয়ে গেছে। আর, আমার ক্ষিধে ক্রমাগতই বাড়ত।

ঋতু সে ক্ষিধে মেটাতে অরাজী।

ঋতুর স্বামী আছে, ঋতুর ধারণা তাতে ধর্মভ্রষ্ট হবে সে। বিশ্বাস ভঙ্গ করবে। ঋতু সতী। ঋতু সাধ্বী। ঋতু সাবিত্রী।

ঋতু বলত, সব ত দিয়েছি, আর কিছু ত আমার দেবার নেই।

নেই ?

ঋতু বলত, না।

আমি রাগ করতাম। আমার রাগ ভাঙানোর জন্যে ঋতু আমাকে সজোরে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতো এবং দাঁতে ঠোঁট কাটত।

ঋতুর ঠোঁট পুরু, লালায় ভেজা, নরম নরম।

আচ্ছা, চুমু খাবার সময় লালাটুকু এড়িয়ে যাওয়া যায় না ?

আমি কোনদিন পরীক্ষা করি নি। ঋতুও নয়। ঋতু সে সুযোগ আর আমাকে দেবে না, আমিও নয়।

ঋতু পরস্ত্রী। আমার দূর সম্পর্কের এক মামার স্ত্রীর সহোদরা। আমার পূজনীয়া। অবশ্য বয়সে নয়, মানে। অথচ সে যখন আমাকে ভীষণ ভালবাসত, তখন বার দুই সে আমাকে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করেছিল।

ঋতু সুন্দর প্রণাম করে। আমার ভাল লাগত তার প্রণাম, প্রণামের ভঙ্গী।

আমি যখন তাকে দুহাতে তুলে ধরতাম, যখন—না থাক।

ভাব হবার আগে, যখন সে আমার মাসীই ছিল, তখন তাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম বলে সে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ছি ছি করে উঠেছিল। বলেছিল, ও কি হচ্ছে ? আমি ওসব পছন্দ করি নে।

আমি আর কখনো ওকে প্রণাম করি নি। সে আমাকে করতে দেয় নি। কেন দেয় নি সে ? অথচ আমার বড়, আমার দাদা, ওকে প্রণাম করেছে, ও পছন্দও

করেছে—আমি দেখেছি।

ঋতু বলত, আমার সম্পর্কে তার ভীষণ কৌতূহল।

ঋতু বিশুদ্ধ মেয়েছেলে। সে আমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানত। এবং তাই সে একদিন কথায় কথায় বলেছিল, তুমি নষ্ট হয়ে গেছ। একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছ। বিশ্বাস কর, সে জন্যেই তোমাকে আমার এতো ভাল লাগে। তুমি যদি আমার স্বামী হতে, তা হলে—

ঋতু দম নেবার জন্যে থেমেছিল। গলার স্বর ভারী করে বেশ আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেছিল, এ জন্মে আর হল না, পরজন্মে তোমাকেই চাইব।

ঋতু তার স্বামীকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল, ভালবেসে। তবু ঋতু আমাকে চায়। জন্মান্তরে আমাকে কামনা করে। আমি জানি ঋতু আরও দুজনকে ঠিক একথাই বলেছিল। ওর দিদির দেওর কল্যাণকে আর ওর স্বামীর বন্ধু সৌমিত্রকে। বলুক, তাতে ক্ষতি হয় না। কিছুই হয় না। ঋতু জানে, ও কথার কথা। কিন্তু আমার?

ঋতু! তোমার ওই মিষ্টি মিথ্যে কথাগুলো শোনার সামান্য সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলে কেন? কেন তুমি অমন বিশ্রী শপথ করে আমার মুখের উপর অন্ধকার ছুঁড়ে মারলে?

জন্মান্তর আমি মানি নে, তুমি জান। কিন্তু এ-জন্মকে আমি অস্বীকার করতে পারি নে। করি নে। ও জন্মে তোমার স্বামী হবার সৌভাগ্য আমার সইবে না আমি জানি, তুমিও জান। তবু কেন এ জন্মে তোমার জড়ানো গলায় বলা ভালবাসার কথা শোনার স্বল্প আনন্দ থেকে আমাকে রেহাই দিলে? অথচ তুমি পুরোপুরি নয়, সিকি মনে চাইলেই স্বামী নয়, স্বামীর মতো আমি হতে পারতাম। নিশ্চয়ই পারতাম। কিন্তু তোমার দ্বিধাতেই আমার সর্বনাশ হল। আমি ঠকলাম।

ঋতু। তুমি যতটুকু অশিক্ষিতা ততটুকু সরল হলেই তোমাকে পেতাম, একান্ত করে পেতাম। তাতে লাভ হত আমার। আমি এ লেখা লিখতাম না। তুমি মরতে।

ঋতুরা মরে না। ওরা ফিরে ফিরে আসে। বার বার আসে।

ঋতু। তোমার স্বামীর পদবী কি? মিত্র?

মিত্র ওর স্বামীর পদবী। ঋতু তার নামের আগে কুমারী লিখতে ভালবাসত। আমার খাতায়, বইতে, বহুবার সে 'কুমারী ঋতু মিত্র' লিখেছিল। ঠাট্টা করলে

বলত, আমি কুমারীই। নই বুঝি ?

ও দুঃখ পাবে বলেই আমি সহজে স্বীকার করতাম যে, সে কুমারী। তা সত্ত্বেও সে, আমার মনে ওর কুমারীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ যাতে অবশিষ্ট না থাকে তার জন্যে বলত, অবশ্যই দেহে নয়, মনে।

কুমারী ঋতু মিত্র দেহ ও মনের তফাৎ বুঝত, আমাকেও বোঝাতো।

তাই বলছিলাম, ঋতুকে বোঝা যেত না, আমাকেও নয়। শহর বাসের এই-ই সুবিধে। দেখে দেখে, শুনে শুনে, অনেক দূর যাওয়া যায়।

সেই মেয়েটাকে মনে আছে, যাকে ভারত-সংস্কৃতির মণ্ডপে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ? সেই যে সংস্কৃতের অধ্যাপকের মেয়ে! কি নাম যেন ? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বর্ণালী কর। তুমি যাকে বর্ণা বলে ডাকছিলে। সেদিন তাকে বাসে দেখলাম। ওদের সংসারে এত কিসের অভাব ? সত্যি সেদিন দেখলাম, ওর জন্যে তিনটি ছেলে স্টপেজ ভুলে টারমিনাসে চলে গেছে।

বর্ণা কি পুরনো তার ছোটবেলার ব্লাউজ পরেছিল ? নাকি ইতিমধ্যে গায়ে বেড়েছে ? কই, আমার কিন্তু তেমন মনে হয় নি। আর অভাব ? তাও ত মনে হল না। জর্জেটের যে শাড়ীটা পরেছিল সেটা একেবারে নতুন। রঙটা চকচক করছিল। সেটা কাঁধে রাখতে পারছিল না বলে বার বার পড়ে যাচ্ছিল। আচ্ছা! তুমি চেষ্টা করলেই ত একটা লেসপিন কিনে দিতে পারতে। তুমি না ওর বন্ধু ? কত আর খরচ পড়ত, অথচ বর্ণাকে এত ব্যতিব্যস্ত হতে হতো না তিন তিনটি ছেলের সামনে। এমন অপ্রস্তুত!

বর্ণা কলেজে পড়ে না। স্কুলেও নয়। সে বার কয়েক ম্যাট্রিক ফেল করেছে। না ?

তা হোক, বর্ণা বাড়ী বসেই অনেক কিছু শিখেছে। শিখা-সীমাদের চাইতে কিছু কম শেখে নি। শিখা-সীমারা স্কুলে পড়েছে, তারপরে য়ুনিভার্সিটিতে গেছে। বর্ণা স্কুল না-ডিঙিয়েও য়ুনিভার্সিটিতে গেছে। বর্ণা ওদের চাইতে কম কিসে ? তিন তিনটে ছেলে স্টপেজ ভুলেছিল ওর জন্যেই ত!

বর্ণা অনেক জানে। তবু আশ্চর্য! বর্ণা ব্রেশিয়ার পরে না। বর্ণার লাগে না। শিখা-সীমাদের লাগে, না হলে চলে না।

ঋতুরও লাগে।

ঋতু শিখার মতো। ঋতু সীমার মতো।

ঋতুর ডজনখানেক ব্রেশিয়ার। হোক, ঋতুর ব্লাউজের কাপড় খুব খাপি।

শিখা-সীমাদের মতো পাতলা নয়। তা বলে ঋতু কারো চাইতে কম স্মার্ট নয়। ঋতু সবটুকু ঢেকেও অনেকটুকু প্রকাশ করে। ঋতু কুশলী। ঋতু শিল্পী। এবং আমার প্যান্টের সংখ্যা ঋতুর ব্রেশিয়ারের সমান সে তো তুমি জানই। আমার ধুতি পাঞ্জাবীও তুমি দেখেছ। তাছাড়া আমার সঙ্গে কথা বলে কি তোমার কখনো মনে হয়েছে আমি কারও চাইতে কিছু কম বুঝি? কাফ্‌কা থেকে কামু, রিলকে থেকে এলিয়ট, গর্গা থেকে মাতিস, মার্ক্স থেকে ম্যান্‌-হাইম, কাণ্ট, ক্রোচে, নিউটন, আইনস্টাইন সব নাম ত আমার কণ্ঠস্থ। তাও বা কেন, গভীর কোন তত্ত্বালোচনায় আমাকে কি কখনো ক্লান্ত মনে হয়েছে? আমি কি অস্তিত্বের জটিলতম সূত্র বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিই নি যে অতিমাত্রায় সচেতনতাই আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে? নিশ্চয়ই সেদিন স্পষ্ট করতে পেরেছি যে মৃত্যুই হচ্ছে শেষ, তার আগের সবকিছুই এই মৃত্যুর প্রস্তুতি। এবং বাঁচার অর্থ, অস্তিত্বের ধারণা, সুখের বোধ, এ সমস্তই আপেক্ষিক। মৃত্যুতে যে পরিণাম, যে নির্দিষ্টতা, এই-যে চরম এবং পরম, এ কি বুঝতে তোমার কষ্ট হয়েছে? আমি কি বোঝাতে পারি নি?

তুমি আজ যাই-ই বল, সেদিন কিন্তু তোমার মুখে চোখে স্পষ্ট শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করেছিলাম। এখানেই আমার আর ঋতুর জিত।

আমি জীবন ও জগতের তত্ত্ব তোমাকে বুঝিয়েছি। ঋতু দেহ ও মনের তফাৎ বুঝিয়েছে আমাকে।

আমরা অনেক কিছুই বুঝি। তোমরাও। যেমন বুঝি ছোটবেলায় পড়া সেই কথাটা—'কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রচুর!'

আমরা শিউলি-বেলের গন্ধ পরখ করতে পারি। শিখা-সীমারাও পারে। তুমিও পার। পার না?

আমাদেরও ঘ্রাণশক্তি প্রচুর!

আমার ঘরটা তুমি দেখ নি। ঘরটা রাস্তার ওপরে। রাস্তাটা নির্জন। আমি দোতলায় থাকি।

জানালাগুলো দরজার মতো বড়। আমি জানালা দিয়ে অনেক কিছুই দেখি। নীলান্ত আকাশ, শ্যামলী পৃথিবী, বিচিত্রবর্ণা ঋতু, এমন কি নিজেকেও।

ঋতু এ ঘরে প্রায়ই আসত।

ঋতু আসত, বসত, ঘুমের ভাণ করে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ত।

ঋতুর ভীষণ ঘুম পায়। সে ঘুমকাতুরে।

সে আমাকেও ঘুম পাড়াতো।

এঘর থেকে রাস্তার ওপাশের বিরাট মাঠটা দেখা যায়। মাঠের চারদিকে অনেক গাছ। আমার ঘরের সমুখেও। দোতলা থেকে চোখ মেললে মাঠের ওপাশের বাড়ীগুলো দেখা যায় না। ওদিকটাকে ঘন বন বলে মনে হয়। ওদিকে যারা থাকে এদিকটাকে তাদেরও কি তাই মনে হয়? কে জানে? আমার ঘরে কিন্তু বিকেলে বনের অন্ধকার! তেমনি গাঢ়, ঘন এবং নিঝুম। ঋতু বিকেলেই আসত।

আজ ভীষণ মেঘ করেছে। গুড় গুড় শব্দে ফেটে পড়ছে আকাশ। শাঁই শাঁই বাতাস বইছে, গাছগুলো ভীষণভাবে দুলছে। খুব নীচে নেমে এসেছে মেঘ, গাছের ওপর। আকাশ ভেঙে পড়বে বুঝি! কে জানে? কতগুলো পাখী ভয়ে ছুটোছুটি করছে। কতগুলো ডাকছে পাতার আড়ালে। ধুলো উড়ছে বড্ড। উড়ুক।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এল, বৃষ্টি।

বর্ষায় কবিতা আমার ভাল লাগে। ঋতুর লাগে না। শিখা-সীমাদেরও না। ওরা কবিতা বোঝে না; ওরা কবিতা করে। ওরা কবিতা।

আমি সে কবিতাগুলোকে হারাতে দিই নে, ধরে রাখি। নমুনা দিচ্ছি, বুঝে নিও।

সীমা হাঁটছে। আমি দেখছি। খোঁপাটা চুড়োর মতো টেনে বাঁধা। ঘাড়টা কি পরিষ্কার, নিটোল এবং মসৃণ।

সীমা হাঁটছে। কোমরে কি কোমরবন্ধ ওর? না ত! জরীর পাড়। পাড়টা ঢেউয়ের মতো। কাঁপছে।

শিখা আসছে দ্রুত পায়ে। এগিয়ে আসছে।

এত বাতাস কেন? ঝড় উঠবে বুঝি? শিখার এলোচুল যেন পাল। আঁচলটা যেন হাল। শিখা টলছে।

শিখা যেন নৌকো। কী ভীষণ গভীরতা তার! এত গভীরতা ও কোথায় পেলো।

শিখা! বৈঠাতে কাউকে বসিয়ে দাও। হাল ধরুক। নইলে তুমি ডুববে। ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার উপর। তুমি মরবে।

শিখা! আঁচলটাকে কষে বাঁধো। নইলে জল ঢুকবে। জল।
শিখা মোটা হচ্ছে। মেদ বাড়ছে। মেদে কি বাড়ে? লাবণ্য? না, জল?
শিখা টলটল করছে। শিখা তুমি জল হয়ে যাচ্ছ, তুমি শিখা হও; দাউ দাউ শিখা।
আরও শ্যাম্পু মাখলে তোমার চুল শিখা হবে। ট্রয় পুড়বে।
শিখা, তুমি হেলেন!

ঋতু কাঁদছে। হাসলে মাণিক ঝরে, কাঁদলে মুক্তো। মুক্তো ঝরছে।
ঋতু! চোখের পাতা কাঁপিও না। ভেজা-পল্লব কি সুন্দর। অপূর্ব!
কাঁদলে তোমাকে ভাল দেখায় ঋতু। তুমি কাঁদ। ডুকরে ডুকরে নয়, নীরবে।
দোহাই তোমার, একটিও কথা বলো না। বুঝেছি, কোথায় তোমার দুঃখ।
তোমার দুঃখে আমার সুখ। তুমি কথা কয়ো না, আমি বুঝেছি।
ঋতু আমার হাতটা টেনে নিল। এই-ই ভাল। কি স্পষ্ট ঋতুর হাতের কথা।
তার সমস্ত কথাই আমার দেহের দিগন্তে রৌদ্রের মতো জ্বলছে।
ঋতু! হাতে কথা বল। আরও বল। ঋতু! থেমো না।
ঋতু আমার হাতটাকে বুকে ঠেকাল।
এ কী!
ঋতু হাসল। ঋতুর হাসিতে মাণিক ঝরে।
ঋতু! আর হেসো না। মাণিক আমার অপছন্দ।
ঋতু হাসলেই ছলনাময়ী। তখন সে অ-ধরা।
ঋতু যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। ঋতু চলে গেল।

তুমি জান আমি কবিতা লিখি। কল্পনায় কবিতা। এগুলো সে কবিতা নয়, এ বাস্তব। আমার অভিজ্ঞতা। তোমারও। তোমাদেরও। এ না বোঝার কথা নয়।
এবং এ-বৃষ্টিতে এগুলো বোঝা সহজ। ভীষণ সহজ।
এখনো ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে। পড়ুক।
বৃষ্টি আমার পছন্দ।
সেই কবে প্রথম কাগজের নৌকো বৃষ্টির জলে ভাসিয়েছিলাম মনে নেই। তবে সেই ভাসানো এখনো চলছে, এটুকু মনে আছে। মনে আছে, আরও ভাসাব।

ভাসাতে হবে।

আচ্ছা, আমরা কি কোথাও থামব না?
ঋতু ত থামতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কি হল? থামতে কি পারল? পারে নি।
আমিও পারব না, তুমিও পারবে না। শিখা, সীমা, বর্ণা কেউ-ই পারবে না।
তাহলে কি হবে?
ঋতু শিখা সীমা বর্ণা ওরা কি বলে? কি ভাবে?
ওরা ভাবে না। ভাবতে জানে না। ভাবতে চায় না।
সেই-ই ভাল।
আমরা ছুটোছুটি করব। সীমা হাঁটবে বাড়ীর দিকে, শিখা য়ুনিভার্সিটিতে যাবে, এবং ঋতু কাঁদবে।
আর বর্ণা? বর্ণা তিনটি ছেলেকে স্টপেজ ভুলিয়ে টারমিনাসে নিয়ে যাবে। টারমিনাসে বাস থামে। বর্ণা তারপরও কয়েক পা হাঁটবে। ছেলেগুলোও। আমাদেরও হাঁটতে হবে। হাঁটতে হয়।
টারমিনাস থেকে বাড়ীর দূরত্ব কতো?
ঋতু জানে। শিখা, সীমা, বর্ণা, আমি, তুমি, আমরা কেউ-ই জানি নে। জেনেও ঋতু না-জানার ভাণ করে। কেন করে?
চেষ্টা করলে ঋতু অভিনেত্রী হতে পারত। শিখা, সীমা, বর্ণারাও পারত। ওরা অভিনেত্রী।

কি ভাবছ বলো ত? নিশ্চয় ভাবছ, যে কালে তুমি জন্মাও নি, যেকাল শুধুমাত্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের স্মৃতিতে বেঁচে আছে, যে-কাল রূপকথার কাহিনীর মতো সুন্দর এবং মসৃণ, যে-কাল একালের মতো নয়, অনেক অনেক ভাল,—সেকালের কথা! না?
স্মৃতিতে কে বাঁচে? কি বাঁচে?
সুখ।
বিশ্বাস কর আর নাই-ই কর, আসলে স্মৃতি প্রতারক। সে দুঃখের মুহূর্তকেও এমন সাজ পরায় যে মনে হয় সেই দুঃখের স্মরণেও সুখ। সেই দুঃখও বুঝি কাম্য।
স্মৃতি বাছাই করে। স্মৃতি মাখন। স্মৃতি সমুদ্রের শক্ত ফেনা। স্মৃতি লবণ।

অথচ আমাদের চারদিকে অঢেল দুধ, সাগরের অগাধ জল, লোনা জল। আমাদের চারদিকে মাখন নেই, শক্ত ফেনা নেই, লবণ নেই। তুমি যদি হঠাৎ কোন অপরিমিত ক্ষমতাবলে সেই সমস্ত অথর্ব বুড়োবুড়িকে পলকে পেঁৗছে দিতে পার সেকালে, যদি ওঁরা ওঁদের স্মৃতির কালে পা রাখেন, তাহলে বিশ্বাস কর, তাহলে, ওঁদের আর্তনাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের দীর্ঘশ্বাসে সিক্ত হাহাকার মুখ ঘুরিয়ে হাসবে। হাসবে, কারণ কোলাহলের ক্ষমতা উভয়েরই সমান। দু'দলই তুল্যমূল্য।

আমার কথা তোমার বিশ্বাস হল না। তুমি অস্বীকৃতিতে ঘাড় নাড়ছ, আমি স্পষ্ট দেখছি।

তুমি মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ। তুমি অন্ধ।

আমরা সবাই অন্ধ!

তুমি অন্ধ অতীত স্মরণে, আমি অন্ধ বর্তমান যন্ত্রণায়। আর ওরা—যারা সবে একে অন্যের গলায় মালা পরাল, তারা অন্ধ—ভবিষ্যৎ সুখ কল্পনায়।

আসলে এই অন্ধত্বই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। তা যদি না হতো মানুষের ইতিহাস সে-ই কবে শেষ হয়ে যেত।

অন্ধত্বই মানুষের ইতিহাসকে বিস্তৃতি দিয়েছে। ঋতুকে করেছে প্রগলভা, সীমাকে উচ্ছল, শিখাকে উজ্জ্বল, এবং বর্ণাকে চতুরা।

আজ আমরা ওদের প্রগলভতায়, উচ্ছলতায়, উজ্জ্বলতায় এবং চতুরতায় উঠছি, বসছি, ছুটছি।

না, ওরা আবার এও বলতে পারে, যে তোমাদের ওঠা বসা ছোটার জন্যেই ত আমরা প্রগলভ, উচ্ছল, উজ্জ্বল, চতুর।

আমি প্রতিবাদ করব না। কারণ এ মিথ্যে নয়।

তাহলে?

ঋতু বলত, অভিযোগ করত, আমি তোমাকে আজও বুঝতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম না, তুমি সত্যি কি চাও?

আমি কি চাই? কি চেয়েছিলাম?

ঋতু! এ বড় জটিল প্রশ্ন। আমি কি চাই তা কি আমিই জানি। একটি একটি শুধোও, হ্যাঁ না জবাব দেব। কিন্তু যদি একমাত্র চাওয়ার কথা

জিজ্ঞেস কর ঋতু, আমি ত সাধারণ একটি মানুষ, বরং তুমি তোমার ভগবানকে জিজ্ঞেস করো, দেখবে তিনিও বোবা হয়ে গেছেন। কি জবাব দেবেন তিনি। এই যে বিরাট পৃথিবী, এ পৃথিবীর স্তরে স্তরে এত বস্তুপুঞ্জের সমাবেশ করেছেন কেন, কি জন্যে, কি চেয়ে, যদি জিজ্ঞাসা করো, তিনিও মৌনী হয়ে যাবেন মুহূর্তেই। কারণ, তিনিও জানেন না। আমাদের জীবনেও ঠিক তাই ঋতু। তুমি আমার বিশ্রী মুখে যত মমতার রঙ ঢেলেছ, আমি তোমার সুশ্রী মুখে তত মনের মাধুরী মিশিয়েছি। তারপরে দুজনে দাঁড়িয়েছি মুখোমুখী। দিনে দিনে দুজনের ভাললাগা একটি বিন্দুতে এসে মিশেছে। দুজনে বসেছি পাশাপাশি, শুয়েছি। অনুপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়েছি, উপস্থিতিতে সুখী। ঋতু! আমরা কি চাই সে প্রশ্ন তখনো কেউ কাউকে শুধোই নি। আমি শুধোই নি, যদি তুমি জবাব দিতে না পার, তাই। তুমি অধীরা, হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলে। নিরুপায় আমি কি বলেছি জানি নে, তোমার মনঃপুত হল না। তুমি ছড়িয়ে দেওয়া মমতার রঙ কুড়িয়ে নিতে মন দিলে।

ঋতু! দিনে দিনে যত্নে বাঁচিয়ে তোলা সেই কলম-করা গাছটা মরল! তুমি ভাবলে, আমি এতদিন অভিনয় করেছি।

ঋতুর ধারণা আমি একজন পাকা অভিনেতা।
ঋতুদের ধারণা আমরা সবাই অভিনেতা। পুরুষ মাত্রেই।
ওরা বলে, পুরুষের মন, সহস্র বর্ষের নয়, 'শতলক্ষ বৎসরের সাধনার ধন'।
ওরা অতি সহজেই পুরুষের মনের 'পরে নিরানব্বুই লক্ষ, নিরানব্বুই হাজারের ভার চাপিয়ে দিয়েছে। ওরা জিতেছে। ওরা পারে।
ঋতুরা চিরদিনই অঙ্কে কাঁচা।

আমবাও অংকে কাঁচা। নইলে কেন আমরা পাটিগণিতের সূত্রগুলোকে জীবনে টেনে আনি? কেন আমরা বুঝি নে যে, জীবন আর যাই-ই হোকা পাটিগণিত নয়।
জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে আমরা এখনো অপরিণত। নইলে দেখতে দশ থেকে পাঁচ বাদ দিলেও বিয়োগ ফল হচ্ছে দশ। এবং বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করতে

যে, শূন্যের সঙ্গে নয় যোগ করলেও অংকে বা মূল্যে বাড়ছে না, যা ছিল তাই-ই রয়ে গেছে ; অথচ নয়ের সঙ্গে শূন্য যোগ করলে পলকে নব্বুই হয়ে যাচ্ছে।

ঋতু আমাকে এ অভিজ্ঞতা উপঢৌকন দিয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ।

ঋতু যেদিন আমার হাত ধরল সেদিন আমি পলকে নব্বুই হয়েছিলাম। সারা আকাশ হাততালি দিয়েছিল খুশিতে, রোদের রেণু লাফিয়েছিল ঘাস-ফড়িঙের মতো, হাওয়ার কোলাহলে গাছে গাছে রঙীন ফুলের হাট বসেছিল, আমি মুগ্ধ চোখে তাদের রঙ কুড়িয়ে মুখে মেখেছিলাম।

আর, আমি যেদিন ঋতুর হাত ধরলাম, ঋতু অংকে বাড়ল না, একটুও না। টা টা রোদ্দুরে মাটি পুড়ছিল, মরা ডালে বিশ্রীভাবে চেঁচাচ্ছিল একটি কাক। তেষ্টায় আমার সারা মন শুকিয়ে গিয়েছিল। আমি চোখ মেলে দেখছিলাম দুঃসহ এক শূন্যতা, সে ভীষণ, সে সর্বগ্রাসী। আমি অবশ হয়ে যাচ্ছিলাম। এবং ঋতু সরে গেল।

আমার মনে হয়েছিল আমার সঞ্চয়ের দশ থেকে পাঁচ হারিয়ে গেল, একেবারেই হারিয়ে গেল। অথচ আশ্চর্য, দুদিন পরে লক্ষ্য করলাম, আমার কিছুই হারায় নি। আমার সঞ্চয়ের দশ দশই রয়ে গেছে, এবং তারও কিছুদিন পরে সে মূল্যে বেড়েছে। তখন দশের দাম যেন একশ'।

আমি কিছু সুদ পেয়েছি। সে সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরি' গল্পের নায়িকা সোহিনীর চুমুর মতো। সোহিনী চুমু দিত ঘুষ হিসেবে, ঋতুও।

যেমন তুমি লোনের জন্যে ঘুষ দিয়েছিলে সরকারী কর্মচারীকে, যেমন শিখা-সীমারা নোটের জন্যে, প্রশ্নের জন্যে ঘুষ দেয় অধ্যাপককে। বর্ণা যেমন ঘুষ দিয়েছিলাম তিনটি ছেলেকে, যেমন আমি আমাকে দিয়েছিলাম ঋতুকে। ঘুষ আমরা সবাই দিই। বাপ মেয়েকে দেয়, মা ছেলেকে। ঘুষ না দিলে কাজ হয় না। সংসার সমাজ অচল হয়ে পড়ে। প্রগতি আসে না।

আমরা প্রগতিশীল। ঋতুরা প্রগতিশীলা।

ঋতু শুধু চুমু নয়, আরও কিছু ঘুষ দিত। সোহিনীর কালে তার চল ছিল না, নইলে সোহিনীও দিত।

একদিন, মাত্র একটি দিনই ঋতু সেই ফিনফিনে পাতলা শাড়ী পরে এসেছিল, যে শাড়ীগুলো এখন ঘরে বাইরে অনেকেই পরে। সেদিন ঋতুর শরীর, যে শরীর এতদিন শুধু আমার অনুভবে পরিচয় ছিল, আমি প্রথম চাক্ষুষ করলাম, তার দেহের রঙ, তার দেহ।

ঠাট্টা করে বলেছিলাম, কি দরকার ছিল শাড়ীর? ওটা বাদেও ত আসতে পারতে।

ঋতুর মুখ চোখ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। ঋতু ভীষণ মিষ্টি হাসি হেসেছিল। আমিও হেসেছিলাম। আমার চোখ দেখার-সুখ পাচ্ছিল তাই, ঋতু হেসেছিল লক্ষ্য ছুঁতে পারার আনন্দে।

ঋতু মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে অনুযোগ করেছিল, ও কি তাকানোর ঢঙ? অমন অসভ্যের মত তাকিও না বলছি? তাকিও না। আমি মাথা কুটব।

তবু আমি চোখ ফিরিয়ে নেবার প্রয়োজন বোধ করি নি।

ঋতু শুধিয়েছিল, এমন কি দেখবার আছে যে তুমি অত করে দেখছ?

ঋতু কি জানত না কি দেখবার আছে?

সেদিন ঋতুকে জবাব দিই নি। ঋতু দুঃখ পেয়েছিল।

> ঋতু! সেদিন দেখছিলাম তোমার হাজার দুয়ারী ঘরের কক্ষে কক্ষে সাজান আলো, তোমার প্রাসাদের উন্মুক্ত হাজার দুয়ার আর আর অজস্র জানালা। আর দেখছিলাম তোমার দেয়ালের গায়ে ছড়ানো ছিটনো সংখ্যাহীন চুমকীর কাজ, তোমার ঐশ্বর্য।

ঋতু। তোমার অনেক কিছু ছিল। এখনো আছে। আরও কিছুদিন থাকবে। ঋতু যত পার পরে নাও। পরে পস্তাবে। পরলেও তখন কাজ দেবে না। এবং মনে রেখো, এক রকমের সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার আসে না। তাছাড়া তোমার ছেলে বড় হচ্ছে। ছেলে তোমাকে কি ভাববে বল ত?

তাছাড়া তোমার মেয়েও বড় হচ্ছে। বড় হলে সেও ওই ধরণের শাড়ী পরতে চাইবে। যে জন্যে তুমি পরেছ, ঠিক সেজন্যেই। বাধা দিলেও শুনবে না, কিছুতেই না। মা-মেয়ে একই ধরণের শাড়ী পরে ঘুরলে লোকে কি বলবে? তুমি তখন বার বার হেরে যাবে না? সেই হেরে যাওয়া কি সুখের হবে?

ঋতু! এখনো সময় আছে, ঘরে-বাইরে তুমি ওই পরেই ঘোরো। বেশ দেখাবে।

ঋতু! ভোগেই সুখ। যতটুকু ভোগ করলে ততটুকুই লাভ। ছাড়লেই

লোকসান। ত্যাগে মুক্তি নেই, ত্যাগে মৃত্যু। তাই তুমি সবাইকে, সব কিছুকে ধরে রাখবার চেষ্টা কর। আমরা সবাই তাই করছি।
চেষ্টা করলে কেষ্ট মেলে। আমাদেরও মিলবে। এবং গোপনে বলছি, ভুলেও দ্বিধাকে প্রশ্রয় দিও না। যা করছ করে যাও।
দ্বিধাতেই সর্বনাশ। আত্মবিশ্বাসের অভাবেই দ্বিধার জন্ম।

ঋতুর দ্বিধাতেই আমার সর্বনাশ হল। ঋতু আমাকে, আমার অস্তিত্বকে প্রমাণ করার সুযোগ দিল না। তোমার দ্বিধাতে তুমি আর্টিস্ট না হয়ে, কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হলে। ঋতুও কমার্শিয়াল হয়ে গেছে। বড্ড বেশী রকমের বাজারী। অথচ তোমাদের দুজনেরই প্রতিভা ছিল। নির্দ্বিধায়, তোমরা শিল্পী হতে পারতে। নামকরা শিল্পী।
অবশ্য তোমাদের কারও নামডাক কম নয়। তুমি খ্যাতনামা। ঋতুর খ্যাতিও খুব স্বল্প নয়। পাড়ায় নাম ডাক আছে। বললেই চেনে। এও কম কি? বাজারী না হলে কে ঋতুকে চিনত? এক চিনত ঝি মনুর-মা, আর প্রতিবেশী বউ-ঝিরা, বউ-ঝিদের অভিভাবকরা।
ঋতু ভালই করেছে। এখন তাকে অনেকে চেনে। অনেকে মনে রাখে। সে স্মরণীয়া।
ঋতু! তোমার জন্ম সার্থক। যে সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উঠছ, আরও উঠলে, যথার্থই লেডি হবে। সারা দেশ তোমাকে চিনবে।
ঋতু! তুমি যথার্থ লেডি হতে চেষ্টা কর।
তুমি ভাবছ, আমি ব্যঙ্গ করছি। মোটেই তা নয়। লেডিজ সিটে বসার যোগ্যতা অর্জন করলেই লেডি হওয়া যায় না, যেমন জেন্টস সিটে যারা বসে তাদের সবাই ভদ্রলোক নয়। যথার্থ লেডি হওয়ার জন্যে লেডিজ সিটকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে হয়। যথার্থ জেন্টলম্যান হবার জন্যে জেন্টস্ সিট সৌজন্যের সঙ্গে ছেড়ে পিছিয়ে আসতে হয়, লেডিজ সিটেরও পেছনে। না হলে লেডি হওয়া চলে না, জেন্টলম্যানও নয়।

ঋতু! এ সংসারে অনেক রহস্য। সে রহস্যের উৎস খুঁজতে চেয়ো না, হারিয়ে যাবে। তার চেয়ে মেনে নাও। মানিয়ে নাও।

ঋতু! খুঁত খুঁত করলে ঠকবে। পিছিয়ে পড়বে। কি লাভ? কি হয় সমালোচনায়? কিছুই হয় না। আমি হাজার থামতে বললেও তুমি থামবে

না, আমি জানি ; তুমি মিনতি করলেও, আমি হাঁটব।
অতএব চরৈবেতি। এগিয়ে চল। যে এগিয়ে চলে, তার সাথে সাথে তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে।
ঋতু! শুধু আমরা চলছি না, আমাদের ভাগ্যও চলছে। এবং চলাতেই স্বাদুফল, চলাতেই অমৃতলাভ। অতএব এগিয়ে চল।

জানি তুমি প্রশ্নের শর এতক্ষণে ধনুতে জুড়ে ছিলাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে পেছনে টানছ, যাতে এই শর তীব্রবেগে আমাকে বিদ্ধ করে। কিন্তু তার প্রয়োজন হবে না। আমি জানি, তুমি কি শুধবে ?
উত্তরে বলছি, সে কোন চলা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। আমি বলব না। বরং তোমার ভগবানকে জিজ্ঞেস করো! ভুল হল। ভুলে গিয়েছিলাম তুমি নাস্তিক। তুমি বরং তোমার বিবেককে জিজ্ঞেস করো, যদি বিবেক থাকে।
নেই ? উঃ কি আনন্দ। আমারও নেই। আমাদেরও নেই। আমরা ভীষণ এক উকিলের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। আমরা বেঁচে গেছি।

বাঁচার সুখ অপরিমিত। এ সুখ আমি জেনেছিলাম আমার শৈশবে, যেবার আমি প্রথম আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম মায়ের উপর রাগ করে, শুধু দেখবার জন্যে আমি মরে গেলে মা কাঁদে কি না ?
আমি সামান্য উঁচু গাছে লম্বা দড়ি টাঙিয়ে ঝুলে পড়েছিলাম। চোখ বুজে ছিলাম মরে যাবার জন্যে। আশ্চর্য, আমি মরি নি। মাটির উপর দুম্ শব্দ করে পড়ে গিয়েছিলাম মাত্র। মাকে সে কথা বলেছিলাম। মা কাঁদে নি, হেসেছিল। সেই-ই প্রথম জেনেছিলাম, আমি যদি আত্মহত্যা করি কেউ কাঁদবে না, হাসবে। হাসতে দেখেছি ; স্বচক্ষে দেখেছি। প্রমাণ, আমি। আমার এত বছর বয়সে বার ছয়েক আমি আত্মহত্যা করেছি, সবাই হেসেছে। এবং এখন স্থির করেছি আর আত্মহত্যা করব না। কেন করব ? কার জন্যে ? ঋতু শিখা সীমা বর্ণার জন্যে ? বর্ণাদের জন্যে ?
আমি আর বোকা সাজতে রাজী নই।

অথচ আমাদের বন্ধু অসীমটা, কী বোকা! নীরুর জন্যে, নীরুর মতো হতশ্রী একটি মেয়ের জন্যে, রেলের চাকার নিচে গলা দিল। বোকা, অসীম ভীষণ

বোকা। নইলে একবারও কেন তার মনে হল না, বেঁচে থাকলে নীরুর মতো কয়েক গণ্ডা মেয়ে তার চৌকাঠ ডিঙোবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারত না! তারা ডিঙোতই।

কিন্তু রুনু? রুনু আত্মহত্যা করল কেন?
রুনুও আমাদের বন্ধু। তার যুক্তি ছিল অভাবের তাড়না।
রুনু ভুল করেছিল। রুনু সবাইকে সঙ্গে করে বাঁচতে চেয়েছিল। অথচ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বাঁচা চলে না। রুনু পালিয়ে গেলেই পারত। তাও বা কেন, রুনুর মরে কি লাভ হল? অভাবের তাড়না কি থেমেছে? না থামুক। তবু রুনুর বাপ-মা, ভাই-বোন, সবাই কি এখনো পৃথিবীর এই পূতিগন্ধময় আবহাওয়ায় বেঁচে নেই? ওরা সবাই বেঁচে আছে, অথচ রুনু নেই। সে মরে গেছে। অথচ সে বেঁচে থাকলে দেখতে পেত যে বর্ণা ওর জন্যে মরতে রাজী ছিল, সে এখন কি সুন্দরভাবে বেঁচে আছে!

রুনু! এ জীবন বড্ড জটিল। এবং জটিল বলেই বেঁচে সুখ। তুমি মরে কি এমন জটিলতা কমিয়েছ?

রুনু! তুমি ভেবেছ একটি ত কমল। কিন্তু তা হবার নয়।

তুমি মারা যাবার একবছর পরেই তোমার একটি ভাই হয়েছে। তোমার মা-বাবার ধারণা তুমিই ফিরে এসেছ আবার। ভেবেছিল, তোমার নামেই নাম রাখবে। কিন্তু সে কি হয়? মৃতের নামে নামকরণ করতে নেই, সে অমঙ্গলে। বুঝেছ, তোমার নাম জীবিতদের সংসারে অমঙ্গলের তাই তোমার ভাইয়ের নাম রেখেছে, শনু।

তোমার মৃত্যুতেও তোমাদের সংসারের লোকসংখ্যা কমে নি। পরে আরও বাড়বে।

রুনু! তুমি মরে ভুল কর নি?

অসীম, রুনু দুজনেই ভুল করেছে। অথচ একটু ভাবলেই তারা না মরেও আত্মহত্যার স্বাদ পেত, আমার মতো। এবং বার বার নিজেকে হত্যা করতে পারত। অবশেষে নিজেকে হত্যা করার ইচ্ছে থেকেই মুক্তি পেয়ে যেত; যেমন আমি মুক্তি পেয়েছি।

মুক্তি আমরা সবাই চাই। সেদিন তুমিও আক্ষেপ করেছিলে মুক্তির জন্যে। বলেছিলে, ভিড়ের সঙ্গ তোমার অসহ্য। এ কোলাহলে আর কান পাততে পারছ না। আমি বলেছিলাম, ঠিক তার উল্টো। শুধু আমরা নই, সেদিন আমার ঠাকুরটাও তাই বলছিল। সে বলছিল, আমাকে মুক্তি দেন বাবু চলে যাই।

কোথায় যাবে সে? এ শহর তার মুখ ফুটিয়েছে, চোখ ফুটিয়েছে, বাইরে গেলে সে কি অন্ধ হয়ে যাবে না? ঠাকুরের কথা থাক, পাশের বাড়ীর অশিক্ষিতা কালো মেয়েটা, যে মেয়েটা হাজার সেজেও সিঁথিতে সিঁদুর দেয়ার ছাড়পত্র পেল না, যে বার বার বাইশবার নাকচ হয়ে গেল, সেও বলেছিল সেই একই কথা। সেও মুক্তি চায়। সে আর সইতে পারছে না এই দুর্ভাগ্যের দায়; সে চলে যাবে? কতদূরে যাবে সে? দিন কয় আগে ওর বাবাও বলছিল, ওর মাও।

তুমি ভিড়ের সঙ্গ পেয়ে অস্থির, আমি নৈঃসঙ্গের যন্ত্রণায় উন্মাদ, ঠাকুরটা আমার খেয়ালী দায়ভারে ব্যথিত, কালো মেয়েটা ভাগ্যের মার খেয়ে বিব্রত। মেয়েটার বাপ-মা প্রাত্যহিক দৈন্যের চাপে বিভ্রান্ত।

এমনি মার খেয়ে খেয়ে আমরা হয়ত একদিন মূক হয়ে যাব। এ সমস্তই আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। আমরা যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাব; চিরতরে মুক্তি।

আমরা কি এ মুক্তিই কামনা করি? হবে! নইলে কি করে আমি বললাম, আমার মতো মুক্তি পেয়ে যেত!

এ বড় জটিল প্রশ্ন। এ থাক। বরং অন্য কথা বলি।

এ শহরটাকে আমি চিনি নে। অজস্র গলি-উপগলির, সংখ্যাহীন ঘর-বাড়ীর, গাড়ী-ঘোড়ার ভিড়ে আমার ভূগোলের বোধ হারিয়ে যায়। আমার চোখের সুমুখে একরাশ এলোমেলো ভাঙা রেখা, ছড়ানো ছিটনো অসংখ্য বিন্দু, ধোঁয়া ধুলো আর শব্দ, শব্দের রেশ পড়ে থাকে। আলাদা করে সাজাতে গেলেই ফুরিয়ে যাই। খেই পাই নে। ভোর হলে বুঝি—দিন এল, আলো জ্বললে রাত। তবু আশ্চর্য, ঋতুকে আমার আকস্মিক মনে হয় নি। শিখা, সীমা, বর্ণা আমাকে অবাক করতে পারে নি। মনে হয়েছে, এরা লাফিয়ে ডিঙিয়ে আসে নি। এসেছে পায়ে হেঁটে, ক্রমে ক্রমে।

এদের ঘরোয়া রূপ আমি দেখেছি। ঘরের পরিসরে ওদের ব্যস্ত হাতের পরিচ্ছন্ন কাজ আমাকে অবাক করেছে। আমি বিস্ময়ে পুলকে স্মরণ করেছি মায়ের মুখ, কর্মব্যস্ত মাকে। কোথায় যেন আশ্চর্য মিল আছে।

বিকেলের রঙ্গনটিনীকে আমি ঘরণী হতে দেখেছি, প্রগলভাকে বিনীতা।

ঋতুর হাতের কাজ কি পরিষ্কার! কি দ্রুত!

ঋতুর ঘরটা ভীষণ গুছনো। ঠিক যেখানের যা, সেখানের তা। ছবির মতো। কোথাও এতটুকু ছন্দপতন নেই। সব যেন মাত্রা মেনে গুছনো, সাজান।

অথচ ওরা বাইরে বেরলেই অমন ক্ষেপে যায় কেন? কেন যায়?

ঋতু বলেছিল, তোমাদেরই চোখের সুখের জন্যে। নইলে আমাদের অত দায় কিসের!

জবাবে বলেছিলাম, সবাইকে চোখের সুখ দিতে গেলে শেষ সামলাতে পারবে ত?

ঋতু জিভ ভেংচে বলেছিল, দেখাই যাক না।

সেই-ই ভাল। দেখা যাক। মুখে বলেছিলাম, শেয পর্যন্ত যদি সেই গল্পের উড়ে ঠাকুরের মত হয়?

ঋতু আঁচল সামলাতে সামলাতে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। কয়েক পা এগিয়ে এসে চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করেছিল, যথা?

হেসে বলেছিলাম, উড়ে ঠাকুরের ঘরে চোর ঢুকেছিল। উড়ে বললে, চোর ঘরে ঢুকল, বাক্সের তালা ভাঙল, টাকা নিল, নিয়ে বেরিয়ে এল। বললে, সব আমি দেখলাম। আর ভাবলাম, দেখি কি করে।

তারপর?

তারপর সে দেখল চোর পালাচ্ছে। এবং ঋতুর দিকে না তাকিয়ে বলেছিলাম, সে তখনো দেখল, ভাবল, দেখি কি করে।

ঋতু বিশ্রী শব্দ করে হেসে উঠেছিল। আমি চমকে মুখ তুলেছিলাম। ঋতু হাসি থামিয়ে অপলক দেখছিল, সে কী চাউনী! তারপর ঠোঁট বেঁকিয়ে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, মন্টির বাপীকে কি তোমার অত বোকা বলে মনে হয়?

মন্টি ঋতুর মেয়ের ডাক নাম।

আমি হেসে বলেছিলাম, মাথা খারাপ। আমি কেন মিছিমিছি তাকে বোকা ভাবতে যাব?

তাহলে ? ঋতু প্রশ্নের জের টেনেছিল।

সমস্তই আমার মনে হওয়া।

তাই নাকি! এ কথাটা বলতে গিয়ে বিরল শ্লেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল ঋতু।

আমি হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। এত কুশলতা আমার স্বপ্নেরও অতীত। ভাবতে পারি নে দুটো শব্দে এত জ্বালা ধরিয়ে দিতে পারে। তবু বলেছিলাম, তাইত মনে হয়।

ঋতু আর কোন কথা না বলে চলে গিয়েছিল।

একটু পরে এক কাপ চা এনে রেখেছিল আমার সুমুখে। এক প্লেট খাবারও। বলেছিল, তুমি খেতে সুরু কর, আমি আসছি।

এক চুমুকে চা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। রাগে নয়, ক্ষোভেও নয়। মিস্টির বাপীর আসার সময় হয়েছে।

বনের বাঘ সব সময়ে মানুষ খায় না, মনের বাঘ খায়। আমাকে সে বাঘেই খেল। সেই খাওয়া তোমার অজানা নয়। তুমিও ত সে বাঘের তাড়া খেয়ে ছুটে চলেছ ?

কী আশ্চর্য! সে খায় না তাড়িয়ে মারে। এর চাইতে বনের বাঘের পেটে যাওয়া ঢের ভাল। ভাল নয় ?

আমি বহুবার ভাবতে চেষ্টা করেছি কেন এমন হয়! কেন ? ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে গিয়ে যদি হুমড়ি খেয়ে পড়ি, যদি পথ ফুরিয়ে যায়, তাহলে ? তাহলে আমরা কি করব বল ত ?

রুনু আমাকে পাপবোধ সম্বন্ধে এক সময়ে অনেকগুলো কথা বলেছিল। সে বলেছিল, ও কিছু নয়, কুসংস্কার।

> রুনু! আত্মহত্যা করার ইচ্ছেও কুসংস্কার। তা সত্ত্বেও তুমি তাই-ই করলে ? কেন করলে ?

রুনু থাকলে আমার কথার জবাব দিত। দিত, যেহেতু সে কতগুলো থিওরীতে বিশ্বাস করত। আমি করি না। কেন করি না ? অপেক্ষা কর, বলছি।

বরং ওদের কথাই বলি। আশা রাখি তাতেই আমি স্পষ্ট হব।

আমার সম্পূর্ণ বিপরীত গুণাবলীর অধিকারী পুলককে আমি শ্রদ্ধা করতাম। তার গাম্ভীর্য, আদর্শবাদিতা, সুস্থ-চিন্তা, এমন কি তার পঁচিশ বছর বয়সের সহিষ্ণুতা আমাকে ভীষণ লজ্জা দিত। তার সংযম সেদিন পর্যন্ত আমি আকাঙ্ক্ষা করেছি। আমার বাবা ওকে দেখে, ওর সঙ্গে কথা বলে নিজের ছেলে সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোকষ্ট পেয়েছেন আমি জানি। তোমার বাবাও যদি তাকে দেখত ঠিক তেমনতর দুঃখ পেতেন। তার জন্যে ওর বাবার অহংকার ছিল।

ওর বাবা রাজনীতি করতেন। এখনো করেন। তিনি একজন শ্রদ্ধেয় দেশনেতা। দেশনেতা হবার পক্ষে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর মাত্রাধিক্য তাঁর মধ্যে বর্তমান। অথচ আশ্চর্য এই, পুলক ওর বাবার কোন গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে পায় নি। হয়ত পায় নি বলেই ওর বাবা ওকে নিয়ে গর্ব করেন।

পুলকের চালচলন, হাবভাব সমস্তই ওর কাকার মতো। কাকা ছিলেন একজন শিল্পী। মস্ত কেউ নন, পুলক তবু তাঁর মতো।

পুলকের মা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। মার সৌন্দর্যের ছাপ ছিল পুলকের শরীরে। এবং পুলকের কুড়ি বছর বয়সে উনি মারা গেলেন। ওর বাবার সংসার দেখার মত সময় হাতে ছিল না, কাকাই সংসার দেখতেন। বাবা যথারীতি রাজনীতি। বাড়ীতে দ্বিতীয় কোন স্ত্রীলোক ছিল না, দুজন বৃদ্ধা ঝি ছাড়া।

পুলকের কাকা অবিবাহিত। মেয়েদের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা তাঁকে চিরকুমার থাকতে সাহায্য করেছে।

পুলকের মা কতবার বলেছেন, ঠাকুরপো, এবার একটা বিয়ে কর। সংসারে একা একা আর কতদিন কাটাবে!

পুলকের কাকা বলেছেন, ঠিক তোমার মতো একটি পাত্রী এনে দাও, বিয়ে করব।

অনেক চেষ্টা করেও তেমন কাউকে পাওয়া যায় নি।

কিন্তু পুলকের বাবা পুলকের আর একটি মা পেল। তাঁর যুক্তিও যথার্থ। তিনি বলেছিলেন, পাঁচজনের সংসার একার পক্ষে চালিয়ে নেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু বিশ্ব-সংসারের দায়িত্ব যার ঘাড়ে তার পক্ষে মিলিত যাত্রাই শ্রেয়। পুলকের বাবার এ কথাগুলো শুনে মনোদুঃখে গৃহত্যাগ করেছিলেন পুলকের কাকা। আর ফেরেন নি।

পুলকের সংমা পুলকেরই সহপাঠিনী অমলা। রাজনীতির যে মঞ্চে বাঘে গরুতে জল খায়, সে-মঞ্চেই অমলার সঙ্গে সাক্ষাৎ, অতঃপর পরিণয়। পুলক প্রথম দিনই ন্যায্য শ্রদ্ধা অমলাকে দিয়েছে। কোন সংকোচ করে নি। কিন্তু অমলা সংকোচে, লজ্জায় প্রথমে মাথা নিচু করেছে, তারপর যখন মাথা তুলেছে তখন পুলক সেই চোখের দিকে তাকাতে পারে নি। মরমে মরেছে।

অমলা-পুলকের একটি অন্ধকার অতীত ছিল। এবং একটি সুন্দর বর্তমান তারা গড়েছে' না, ঠিক তা নয়; অমলা সুন্দর বর্তমান গড়তে পুলককে সাহায্য করেছে।

পুলক এখন জানে, বুঝতে পারে, পঞ্চান্ন বছরের যুবক রাজনীতিজ্ঞর কাছে বিশ্ব-সংসারের অলিগলি যত স্পষ্ট, ঘরের পরিসরের ছোট্ট সংসার ততই ঝাপসা, ততই অস্পষ্ট।

পুলককে সাহস দিয়েছে অমলা।

যে ভয়, আদর্শবাদ, সুস্থতা সংযম এবং সহিষ্ণুতার উৎস, পুলক সে ভয়কে এক লাফে ডিঙিয়েছে। সে এখন নির্ভয়। আমার মতোই।

আমার অথবা তোমার বাবা পুলককে এখন দেখলে, তার সব কথা জানলে কি বলতেন? আমি জানি না। তবে দুঃখ পেতেন। দুঃখ পাওয়া ওঁদের স্বভাবে।

তুমি নিশ্চয়ই আমার মনোবৃত্তির স্বাভাবিকতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছ। ভাবছ, এর সবটাই কাল্পনিক, নয়ত ভুয়ো।

তোমাকে, তোমার ভাবনাকে আমি বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা করব না, করলে তোমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে। তার চেয়ে ভাল, নিজের বিশ্বাস মতো সত্য অভিজ্ঞতাকে আলোতে আনা।

সেই ঘটনাটা তুমিও জান। অরুণের বউকে খুঁজতে তুমিও ত কম ঘোরাঘুরি কর নি। সে সম্পর্কে কি বলবে?

মালতীকে আজ, একটু আগে ছেলে কোলে করে রিকসায় যেতে দেখলাম। আমাকে দেখে সে হাসল, আমিও হাসলাম।

বল, যে মালতী বিয়ের আট বছর পরেও কোলে ছেলে পেল না, কত মানত, কত কবচ, ডাক্তার-বদ্যি-হাসপাতাল, হেন তেন করল, সে মালতী চার মাস বাইরে, না বাইরে নয়, কাকীমার বাড়ীতে কাটিয়ে ঘরে ফিরল, আর তার সাত

মাস পরেই ফুটফুটে একটি ছেলের মা হল। কি করে হল? সেখানে কে ছিল মালতীর? অরুণ?

না, মালতী মা হয়েছে বলে আমার তিল মাত্র দুঃখ নেই। আমি যথার্থই খুসি হয়েছি। না হলেই দুঃখ পেতাম।

মালতী বড় দুঃখী। নইলে তার বিনীত প্রার্থনাকে কি করে এড়িয়ে গেল সুবিমল? তার ঘনিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষাকে কি করে হেসে উড়িয়ে দিল অনুপম? এবং স্মরজিৎ?

মালতী, নিজেকে, নিজের রক্তের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যা করেছে ঠিকই করেছে। তবুও তোমাকে মনে করিয়ে দিলাম, কারণ ঘটনাটা বহুবার মনে রাখবার মতো।

আসলে জীবন জলরেখা নয়, সরলরেখাও না। জীবন এক-বিন্দুকেন্দ্রিক বহু বৃত্তের বৃত্ত-রেখায় লুপ্ত অস্তিত্ব অজস্র বিন্দুর, প্রতিটি বিন্দুকে স্পর্শ করে যাওয়া লক্ষ কোটি রেখা-সৃষ্ট সহস্র সহস্র অসম-বাহু ত্রিভুজের, চতুর্ভুজের, সংখ্যাহীন এলোমেলো কোণ, ছড়ানো ছিটনো আনাচ-কানাচ, পুঞ্জ পুঞ্জ জটিলতা। সেই রেখা-জটিল এলোমেলোর কোন সুদূরে সেই আদি ও অকৃত্রিম কেন্দ্রবিন্দু দিনে দিনে হারিয়ে গেছে আমরা জানি নে। আমরা খুঁজছি। খুঁজতে গিয়ে জটিলতা জঞ্জাল আরও বেড়ে উঠছে, আরও বাড়বে। তারপরও আমরা খুঁজব। পেঁছিতে চেষ্টা করব সেই অন্ধকারের অতীত— অন্ধকারে, সেই নিঃসীম, সেই সুদূর গভীরে।

দিনে দিনে মানুষের ইতিহাস লুপ্ত হবে। তারপর যুগে যুগে আবিষ্কৃত হবে সংখ্যাহীন মহেঞ্জোদারো, অজস্র হরাপ্পা। আমরাও একদিন ইতিহাস হয়ে যাব।

সেদিন কে মনে রাখবে একালের ঋতুকে? শিখা, সীমা, বর্ণা, অলকা, নীরু আর মালতীকে? রুনুকে, তোমাকে, এবং আমাকে? অথবা পুলক, অসীমদের? কেউ না। আমাদের কেউ-ই মনে রাখবে না। তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে আমাদের বাড়ীর গড়ন, ট্রাফিকের ব্যবস্থা, ঘরের আসবাব, আর আমাদের দেহাবয়ব। আর সে সব দেখে তারা ধারণা করবে আমাদের একালের সভ্যতার প্রগতি, তাদের নতুন স্কেল দিয়ে মাপবে তার উচ্চতা। এবং লিখবে, রাশি রাশি প্রামাণিক গ্রন্থ, যাতে তাদের অনুমানকে যাথার্থ্যের

স্বীকৃতি দেবে। কে জানবে আমাদের জ্বালা, ঋতুদের দাহ ? মহেঞ্জোদারোর ইতিহাসে সে-কথা লেখা নেই। থাকে না।
প্রতিটি সভ্যতার পরিণতি যদি হরাপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো হয়, তাহলে ?

এক লাফেই অনেকটুকু ডিঙিয়ে গেলাম। অপেক্ষা কর, আরও কিছু ইতিমধ্যে গুছিয়ে নিই। নইলে পিছলে পড়তে পারি, ভুল সিদ্ধান্ত করতে পারি পলকে, সমস্তই এলোমেলো হয়ে যেতে পারে মুহূর্তে

ঋতু সেদিন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। এবং প্রচুর বমি করেছে। ঋতু তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে নি। অবশ্য এখন ঋতু প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়মুক্ত। যেহেতু ঋতুর সঙ্গে আমার সেই গভীর মমতার সম্পর্ক আর নেই। ঋতু দীর্ঘদিন আমাকে উত্তেজিত করে না, আনন্দ দেয় না, এমন কি ক্ষণ-মিলনের ওমটুকুও নয়। তবু ঋতু আমাকে ভোলে নি, আমিও নয়।
আমরা দুজনে দুজনকে এখনো মনে রেখেছি।
আমি মনে রেখেছি তার প্রমাণ ঋতুর মতো দেখতে কোন মেয়েকে দেখলে আমি পুলকিত হই, এবং আমার ভালবাসাকে ঠাঁই দেবার জন্যে ঋতুর মতো চতুরা একটি মেয়েকে খুঁজি।
ঋতুর মনে রাখার প্রমাণ এই যে, ঋতু আমার বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যে কটূক্তি করে, এবং আমি প্রকৃতিতে ভীষণ, চরিত্রে হীন, মনোভাবে দীন এ সমস্ত যাকে তাকে শুনিয়ে দিতে এতটুকু কুন্ঠা বা দ্বিধা বোধ করে না। এবং আমার ধারণা, ধারণা নয় বিশ্বাস, ঋতু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে শুধুই আমার ওপর রাগ করে।
রাগ করার অধিকার ঋতুর আছে। আমিই তাকে দিয়েছিলাম।
ঋতু রাগ করুক, কটূক্তি করুক, ঋতু আমাকে আর ভাল না বাসুক, আমি কিছুই মনে করব না। শুধু সে ভাল থাকুক।
তার ভাল থাকায় আমার সুখ।
আমি ঋতুকে সত্যিই ভালবেসেছিলাম। ওর কথা মনে থাকবে। অনেক, অনেক দিন মনে রাখব।
ঋতুরাই ত জীবনের মাইল পোস্ট। সতেরশ ষাট গজ অন্তের চিহ্ন। ত্রিশ সাল থেকে ষাট শুধু একমুঠো সাল। কে হলপ করে বলবে আমি এবছরে এতটুকু

বেড়েছি, বা বুড়িয়েছি। কিন্তু ঋতুদের গুণে যাও তোমার অভিজ্ঞতার বহর দেখে, তোমার স্মৃতির ভার অনুভব করে পলকে বুঝবে তুমি কতটুকু বয়সে বেড়েছে, দেহে-মনে বুড়িয়েছ।

আমি কি মিথ্যে বললাম ?

এ মুহূর্তে স্মৃতি সেতু গড়ল। বর্ণবোধের শৈশব ভাসছে আমার মনে, চোখে দেখছি খর্বাকৃতি বুড়ো জেঠুকে যাঁর মাথা জোড়া টাক, গলায় তুলসীর মালা, পরনে হাঁটুতক কাপড়, গায়ে সুতির আধ-ছেঁড়া গেঞ্জি। আমি তাঁর হাত ধরে, তাঁর চোখ দিয়ে দেখছি ছড়ানো সেই শৈশবের সঙ্গী নদী, নদীর ওপারের কুয়াশার ওড়নার নীচের পাহাড়; পাহাড়ের শীষ ছুঁয়ে পাহাড়ের আড়ালে, দূরে হারিয়ে যাওয়া আকাশ। আর এপারের ছড়ানো বালুভূমিতে বিস্তীর্ণ বিকেলের রোদ, কাঁকড়ার ছুটোছুটি, এলোমেলো শ্যাওলা মসৃণ নুড়ি, খেয়ালী জঞ্জালের হুটোপুটি, তীরের পাতা-ডালে বেজে ওঠা বাতাসের শব্দ, দূরের জেটিতে ভিড় করে থাকা স্টীমারের বাঁশির আওয়াজ, শঙ্খচিল, আরও কত কি! আর এ-সব স্মরণে এল কারণ, কাতু আর নীতাকে আমার মনে পড়েছে। আমি নিজের চোখে দেখছি সেদিনের দেখা ওদের মুখ। ওরা সেই বর্ণবোধের জটিল আঁকিবুঁকির কালেই, যখন বর্ণবোধের স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের স্পষ্ট রেখাক্ষর-গুলো আমার কাছে ভীষণ অস্পষ্ট, তখনই অনায়াসে স্পষ্ট করেছে আদি বর্ণের মাহাত্ম্য। বুঝিয়েছে অতি সহজে আদি বর্ণের বিভাগ, ধারণা করার জন্যে দিয়েছে সহজ সূত্র। আদি বর্ণের সেই বৈচিত্র্য, সুরভিতে মুগ্ধ আমি সেই-যে অকাল মুখরতার অধিকার পেলাম তাতেই আমি শৈশব ডিঙিয়ে পা দিলাম কৈশোরে।

বর্ণবোধের পাঠ শেষ হবার আগেই আদি বর্ণ জ্ঞানের দ্বিতীয় ভাগে হাতে খড়ি হল। আমি পেকে গেলাম।

কাতুর বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। ও আমার এক বছরের বড়। তার প্রথম মেয়ের বয়স এখন তের। ওদের পরিবার রক্ষণশীল। দুবছর পরেই কাতুর মেয়ের বিয়ে দিতে ওদের পরিবারের লোকেরা উঠে পড়ে লাগবে, আমি জানি।

আমি যদি আরও দুবছর অপেক্ষা করি ?

না। নীতার বিয়ে হয়ে গেছে। দুটো ছেলেও।

দোহাই তোমার, আমাকে ভুল বোঝ না।

ভুল বুঝবে কেন ? আমার দেখার মধ্যে কোথাও কুয়াশার অস্পষ্টতা নেই, টুপ্-টাপ শিশির ঝরার মন্দতাও নয়। তবু যদি মনে হয় আমার দেখা অস্বাভাবিক, যদি মনে হয় ন্যূনতম সুস্থতাও আমি হারিয়েছি, তাহলে স্বতঃই প্রশ্ন করব, কেন এমন মনে হচ্ছে ? কেন ?

বরং সেকথা আমিই বলি।

পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক বিচ্ছিন্ন ভুঁইফোড় আমরা কেউ-ই নই। ধমনীতে যে রক্তের ধারা বহমান সে-ধারার ঐতিহ্য আছে। নির্দ্বিধায় বলছি সে ঐতিহ্য আমি স্বীকার করি, এবং করি বলেই তথাকথিত প্রগতিশীলরা যাকে কুসংস্কার বলে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে তার কিছু কিছুকে আমার ব্যবহারে অবাধ প্রশয় দিয়েছি। দিচ্ছি। না, ঠিক হল না, আসলে প্রশয় না-দিয়ে পারি নি।

পারি নি, যেহেতু যে পিতৃত্ব আমার জন্মের জন্যে দায়ী, সে পিতৃত্ব আমার অশেষ শ্রদ্ধার ন্যায্য অধিকারী। সেই শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত করলে আমার পায়ের নিচের মাটির অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে না। আমি মরি। তাছাড়া আমি আরও গভীরভাবে ভেবে দেখেছি, বরং বুঝেছি, গত দিনের যে নীতি-নিয়ম প্রয়োজনে ঠাঁই পেয়েছে গতদিনের মানুষের জীবনে, অনেক ক্ষেত্রে আজকের মানুষ আপন স্বত্ব প্রতিষ্ঠার উগ্র অসহিষ্ণুতায় তাকে উড়িয়ে দিতে চায়। আমি বলি এ ধরণের উগ্র অসহিষ্ণুতা অমঙ্গুলে। সে মূর্তিমান অকল্যাণ। নতুন সব কিছুই চিরদিন নতুন থাকে না। পুরোন হয়; এবং পুরোন হলেই তাকে ঝেঁটিয়ে ফেলতে উঠে পড়ে লাগি। নতুনের এই নেশা মারাত্মক। এ আত্মঘাতী। আমি জানি। জানি বলেই আমি প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে উপস্থিত করছি সচেতন মনে, প্রতিটি শব্দের, বাক্যের ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সজাগ।

বলতে পার, এত সচেতনতা সত্ত্বেও আমার দৃষ্টি একচোখা হরিণের মত কেন ? কেন আমি নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতার বাইরে হাত বাড়াচ্ছি না ? কেন সমাজ সমস্যার অন্য অলি-গলিতে স্বচ্ছন্দ পায়চারি করছি না ?

আচ্ছা, সমাজ বলতে তোমরা কি বোঝ বলত ? আমি কিন্তু নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই বুঝিনে। তুমি হেসে উঠলে ত ? আমি জানতাম তুমি হাসবে। তুমি কেন, তোমার মতো অনেকেই হাসবে। তোমরা কৃতবিদ্য, তোমরা পণ্ডিত। তোমাদের প্রচুর পড়াশোনা, তোমাদের পাণ্ডিত্য অগাধ। আমি স্বল্পবিদ্য একজন, পড়াশোন্য করবার মত স্মৃতির অভাব, চিন্তা

করার মত মগজও নেই। তোমাদের কাছে সমাজ সম্পর্কিত প্রশ্ন তোলা নেহাতই স্পর্ধা। কিন্ত নান্য পন্থা। অন্যে না শুনুক, আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে অবহেলায় উড়িয়ে দিতে পার না। হতে পারে আমি মার্ক্স-ম্যানহাইমের কিছুই জানিনে, কিন্ত তুমি জান আমি আমার আশেপাশের চলমান মানুষ-গুলোকে খোলা মনে দেখতে জানি।

প্রাসঙ্গিক বলেই বলছি, আমার বন্ধু সুবর্ণও আমার কথা শুনে হাসি চাপতে পারে নি। সে মনে করেছে আমার অনেক ছেলেমানুষীর মতো একথাটাও ছেলেমানুষী। বাধ্য হয়ে প্রমাণ দিতে হল। কোন বইয়ের গহ্বরে ডুব দিয়ে নয়, রাস্তার ধারের গাছের ছায়ায় বসে থাকা ঠেলাওয়ালাকে ডেকে এনে। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এমন অমানুষিক পরিশ্রম করছ কার জন্যে।

দস্যু রত্নাকরের মতো বিশ্বাস নিয়ে সে জবাব দিল, দেশ-গাঁয়ের জরু-বেটীর জন্যে।

দেশ-গাঁয়ে হোক, আর এই মুখর শহরেই হোক আমাদের সবার-ই টিকি বাঁধা সেই একটি জায়গায়। সেখানে গোলমাল হলেই তুমি ছুটে বেড়াও চৌরঙ্গী থেকে বেহালা, দমদম থেকে হাওড়া, ছাতুবাবুর গলি থেকে ডালহাউসী। ভেবে দেখ, তুমি কেন সকাল-সন্ধ্যে খাটছ ; কি জন্য সুবর্ণ ছুটছে।

তাও বা কেন ? আমার কথাই ধর। সেই কুঁড়েটা আমার একার পক্ষে কি যথেষ্ট ছিল না ? তাহলে কেন আমি ঘর তুলে তাকে রঙে রঙে এমন করে রাঙিয়ে তুললাম ? কেন ?

আমি বলি, জোরের সঙ্গেই বলি, চারদিকের ছড়ানো সহস্র সম্পর্ক নিয়েই সমাজ। প্রতিটি লোকের গভীরের তার গূঢ় আকাঙ্ক্ষাকে খুঁজে বের কর দেখবে সব কিছুর মূলে এই সম্পর্ক। এবং সে সম্পর্ক কখনো নারীকেন্দ্রিক কখনো পুরুষ-কেন্দ্রিক।

আমি সেজে বেরোই, তুমি দামী পোষাকে বেরোও কোন পুরুষের চোখে ঈর্ষা ধরাবার জন্যে নয়, কোন কোন মেয়ের চোখে কাজল লাগাবার জন্যে। তুমি একথার প্রতিবাদ করবে হয়ত। বলবে, তা নয়, কাজের প্রয়োজনে। অফিসের দশজনের সঙ্গে মানিয়ে চলবার জন্যে। আমি জানি, অফিসের অন্য দশজনও আমার প্রশ্নের উত্তরে এক-ই জবাব দেবে। কিন্তু সে কথা মিথ্যে। সহস্রবার মিথ্যে। নিজেকে, নিজের মনকে যদি চোখ না ঠারো, তবে গভীরে গেলে ইচ্ছার গভীরে, আমার কথার যাথার্থ্য স্পষ্ট হবে।

মেয়েরাও তাই।

হতে পারে অনেকের নয়, কোন একজনের।

আমাদের সমস্ত রকমের ব্যবহার কি এ ধরণের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত নয়?

সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা বাড়ছে, সমাজ সমস্যাও জটিল হচ্ছে। পুরানো সমাজ, তার নিয়ম নীতি ভাঙছে। আরও ভাঙবে। ভাঙুক।

এত স্বল্প পরিসরে এ স্পষ্ট হবার কথা নয়। তার চেষ্টা করব না। আমার দেখার সূত্র ধরে তুমি চিন্তা কর। তাহলেই হবে।

যদিও কিসে কি হয় আমরা কেউই জানিনে, তবু আমরা যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে এমন কি প্রয়োজনে হৃদয় দিয়ে তল খুঁজতে চেষ্টা করি, সম্ভাব্য একটি সমাধানে পৌঁছতে যথাসাধ্য পরিশ্রম করি। আসলে এ সমস্তই মানুষের স্বভাব। এবং মানুষ বলেই—আমরা সযত্নে পোষার পরিশ্রমকে মেনে নিই, যেহেতু আশা, রাজহংস স্বর্ণডিম্ব প্রসব করবে।

রাজহংস চিরদিন হংস ডিম্বই প্রসব করে, তবুও আশার কুহক, তার নিদারুণ ছলনা আমাদের উত্তেজিত করে, উদ্বুদ্ধ করে। আমরা উঠি, পড়ি, তারপরও মরীয়া হয়ে ছুটি। আসলে ফল নয়, ফলের আশা নয়, এই নিদারণ ছোটাটুকুই সত্য, মর্মান্তিক ভাবে সত্য।

নইলে সুবর্ণ, যে আমার অন্তরতম বন্ধু, যার কাছে আমার জীবনের গোপন সব অভিজ্ঞতার মুখ খুলেছি, যে সে-সমস্ত অভিজ্ঞতার আলোকে স্পষ্ট করে আমাকে চিনেছে, আমার সমস্ত দোষ-ত্রুটিকে মেনে নিয়ে ভালবেসেছে, সে কেন এমন কাজ করল, যা আমি কোনদিন ক্ষমার আলোকে যাচাই করতে পারব না; যে আর কোনদিন আমার ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না, যাকে আমি কিছুতেই আর বন্ধুর মর্যাদা দেব না।

সে কি আশায় করেছিল? অথচ সে আমাকে জানত। আমার মানসিকতা তার ত অজ্ঞাত নয়: তাহলে?

সে জানত আমার অসহনীয় নিঃসঙ্গতার প্রহরগুলোকে, যখন আমি নিঃস্ব হয়ে যেতাম, রিক্ত। যখন আমাকে কোন সৎ চিন্তাই উদ্বুদ্ধ করতে পারত না, যখন আমি কুৎসিত চিন্তায়, এক বিশাল শূন্যতায় মরীয়া হয়ে উঠতাম; দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য উন্মত্ততায় উত্তেজিত হতাম। যখন নারী আমাকে নেশাগ্রস্ত করত, মদ আমাকে মাতাল হবার উদ্বেগ উপহার দিত, এবং অনর্গল

অশ্লীল কথা আমাকে দিত অপরিমিত স্বস্তি। এবং আমি বিশ্বাস করতাম দুর্মর ভোগই হচ্ছে নিজেকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র পথ, ফলে আমি ছুটতাম অন্ধকার থেকে অন্ধকারে। মনে হত মিথ্যে আর সব কিছু—বিবেক, ধর্ম, নীতি, নিয়ম। সে এমনি মুহূর্তে নিজেকে বহুবার তুলে ধরেছে আমার সম্মুখে ; বোঝাতে চেয়েছে সে এক শুদ্ধ দৃষ্টান্ত।

ঈশ্বর ! কাকে বোঝাব আমি। আমি কি করে বোঝাব যে সে আদৌ কোন দৃষ্টান্ত নয়। এ পৃথিবীর ইতিহাসে সে একটি অতি নগণ্য, অতি ক্ষুদ্র এক সাধারণ জীব, যে বাঁচার দায়ে চাকরি করেছে, সামাজিক সম্পর্কের খাতিরে সম্ভাব্য নিয়ম পালন করছে (অবশ্য নিয়মভঙ্গে তার স্পর্ধার তুলনায় আমার অপরাধ নগণ্য, নিতান্তই নগণ্য)। এবং সহস্র সাধারণ গৃহপালিত জন্তুর মতো সে পরশ্রীকাতর, লোভী, ঈর্ষাতুর, সংকীর্ণ ও অন্ধ।

আর আমি গত পনেরো বছর ধরে অসামাজিক জীবন যাপন করছি, নিঃসঙ্গ, একক জীবন। যার কাছে সামাজিকতার মূল্য গৌণ, যে রুচির ধার ধারে না, যে যাচ্ছেতাই করতে নির্দ্বিধ, যে আপন সাম্রাজ্যে একচ্ছত্র সম্রাট। এবং যে সারাক্ষণ হাত বাড়িয়ে আছে হাত বাড়িয়ে পাবার জন্যে, সে যা কিছু হোক,—ধুলোমুঠি বা সোনামুঠি।

সুবর্ণ ভীষণ ভুল করেছে।

না, তার আগে একটি গল্প বলি। না, ঠিক গল্প নয়, একটি ছোট্ট ঘটনা, কোন এক আসরে আমি শুনেছিলাম। এবং যতদূর মনে পড়ে, কোন একটি ফরাসী বই থেকে এটা উদ্ধৃত করেছিল একজন। আজ ঠিক তার নাম, বা কোন আসর সে সব স্পষ্ট মনে করতে পারছি না, কিন্তু বক্তব্যটা মনে আছে ঃ

দীর্ঘদিন কারাবাসের পর একটি কয়েদী জেল থেকে মুক্তি পেল। যখন জেলের গেট পেরোচ্ছে তখনও সে বার বার ভাবতে চেষ্টা করছে সে মুক্তি পেয়েছে ; একেবারে মুক্তি। কিন্তু জেলের গেট পেরিয়ে বাইরে আসার পর তার মনে হল, আমি যে মুক্তি পেয়েছি তার প্রমাণ কি ?—সে নিজের শরীরে প্রথমে চিমটি কাটল, তারপর সে নিজের ইচ্ছেয় গায়ের কোট খুলল। কিন্তু এসব ত মুক্তি পাওয়াকে প্রমাণ করে না ? সে দ্রুত ছুটল, আবার ফিরল। তার মনে হল মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এও যথেষ্ট নয়। তা হলে ?

সে পট্ পট্ করে প্যান্টের বোতামগুলো খুলে রাস্তার উপরেই প্রস্রাব করতে লাগল, শুধু তাই নয়, তার প্রস্রাবের ধারা দিয়ে সে নিজের নামের আদ্যক্ষর

লিখতে লাগলো। ফল হলো এই, যখন সে অনুভব করতে শুরু করেছে সে মুক্ত, ঠিক সেই মুহূর্তেই পুলিশ এসে তাকে আবার গ্রেপ্তার করলো। এবং সে স্পষ্টই বুঝলো যে, হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে সে সত্যি মুক্তি পেয়েছিলো, নইলে তাকে আবার গ্রেপ্তার করলো কেন?

সন্দেহ নেই এ কয়েদী অসাধারণ। কিন্তু একবার ভেবে দেখো তো দীর্ঘদিনের কারাবাস তাকে কোথায় ঠেলে দিয়েছে? সে মুক্তি পেয়েও মুক্তির বোধ থেকে বঞ্চিত। এবং সেটা প্রমাণের জন্যে সে কি নিদারুণ মূল্য দিয়েছে?

এ ঘটনার উল্লেখ করলাম শুধুই একটা জিনিশকে স্পষ্ট করার জন্যে। শুধু বোঝানোর জন্যে যে, কোনো বোধই শাশ্বত নয়, সবই আপেক্ষিক। যেমন ধরো, একটি নিঃসঙ্গ মানুষের বেঁচে থাকা। যার প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে সবাই তার শত্রু, সবাই একমাত্র তার বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করছে। সে দেখছে বিচিত্রবর্ণা পৃথিবীতে এত রূপ-রস-গন্ধ-আলো-হাওয়া—অথচ কি আশ্চর্য! এ সব কিছুতে তার এতটুকু অধিকার নেই। সে নিঃসঙ্গ, ভীষণ একাকী। এমনি করে দিন যায়, মাস যায়। হঠাৎ একদিন হয়তো তার মনে হলো, সে বেঁচে নেই। সে মৃত। সে নিজেকে নিজে ক্ষত-বিক্ষত করলো। ছিঁড়লো, জুড়লো। না, তাতেও সে কিছুই প্রমাণ করতে পারলো না। সে উঠলো, বসলো, ছুটলো। বিশ্বাস করো এ যে কি নিদারুণ, কি মর্মান্তিক তোমাকে বোঝাতে পারবো না। এ কি শুধু মনে হওয়া? না। এক সময়ে তার ইচ্ছে হলো সে প্রমাণ করবে? কি প্রমাণ করবে সে? প্রমাণ করবে, সে জীবিত না মৃত। এবং তার জন্যে সে ছিটকে পড়লো। ভেবে দেখো, এর আগে সে দীর্ঘদিন নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করেছে, কখনও নীতির কাছে, নিয়মের কাছে, সমাজ-শাসনের কাছে পরাস্ত হয়েছে। কখনও বা নিজে অবিবেচকের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এক সময়ে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। সে তৎপর হলো প্রমাণ করতে। না, আর নিজের সঙ্গে যুদ্ধ নয়, এবার সমূহ শাস্তি।

তুমি বলো, জীবন্মৃতের কাছে ন্যায়ই বা কি, নীতিই বা কি। সে এমন একটা কাজ করলো যা দশের চোখে অসামাজিক, যা অন্যায়—কারণ ওরা শুধু বাইরে থেকেই দেখেছে, গভীর থেকে নয়। সে দায়রায় সোপর্দ হলো। প্রমাণিত হলো সে অপরাধী। শাস্তি প্রাণদণ্ড। অর্থাৎ বিচারে প্রমাণিত হলো সে জীবিত। কিন্তু কি চরম-মূল্যেই না এটুকু প্রমাণিত হলো? এও বা কেন? রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কথা মনে করো। কাদম্বরী কি এমনতর

নিঃসঙ্গতার জন্যেই মরে প্রমাণ করেনি যে সে বেঁচে ছিলো? অথচ এ সমস্ত মানুষের স্বভাবের বাইরের কিছু নয়। মানুষকেই প্রমাণ করতে হয়, সে সামাজিক; মানুষের নিজের ব্যবহারই তাকে দাঁড় করায় কাঠগড়ায়, প্রমাণিত করে সে অসামাজিক। এবং বলি মানুষের বিচারের একমাত্র মানদণ্ড মানুষই। আইন-নীতি-নিয়ম-সংস্কার মানুষকে কতটুকু স্পষ্ট করেছে? করতে পেরেছে? সবচেয়ে বড়ো কথা কি জানো, সামাজিক মানুষই যে একমাত্র মানুষ নয়, অসামাজিক মানুষও মানুষ—একথা আমরা একেবারে ভুলতে বসেছি। আসলে সংস্কারকে মানা পশুর ধর্ম, মানুষের ধর্ম তাকে নিয়ত ডিঙনো। মনুষ্যত্বের কোনো বাঁধি ফরমুলা নেই, সে ইতিহাসের মতোই গতিশীল। সে জ্যামিতি বা অঙ্কের ফরমুলা নয়, সে নদীর স্রোতের মতো বহমান, প্রবাহিত।

সুবর্ণ এটুকু বোঝে না।

অথচ কি আমি করেছিলাম? কিছুই না। শুধু মিথ্যে একটি ঘটনা বানিয়ে বলেছিলাম তাকে, যে ধরণের মিথ্যে আমি আকচার বলে থাকি, শুধু রগড় করার জন্যে। শুধু কতক্ষণ নিজেকে ভুলে থাকার জন্যে। সুবর্ণ তাতেই জ্বলে উঠলো; আমি সুবর্ণর দুর্বলতার কথা জানতাম। এবং হলপ করে বলছি, শুধু মাত্র ওকে ক্ষেপানোর জন্যেই সে-কথাগুলো বলেছিলাম। সুবর্ণ ভুল বুঝলো।

> সুবর্ণ, আমি তুমি নই। আমি আমি। আমার ঔদার্যে তুমি পরিচিত। সেই তুমি আমার হিতের (কী ভীষণ সুন্দর হিতসাধনের ইচ্ছা! বাহবা সুবর্ণ! বাহবা!) জন্যে ঘৃণ্যতম পথ বেছে নিলে। আমি তোমার ব্যবহারে মূক হতবাক। মনে হয়েছিলো সে মুহূর্তে এই বিশাল পৃথিবী প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সহস্র খণ্ড হয়ে যাক, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাক সমস্ত কিছু, আর আমি সেই ধ্বংসস্তূপের অতলে চিরদিনের মতো তলিয়ে যাই।

অথচ সুবর্ণর কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। আমি সুবর্ণর কাছে কৃতজ্ঞ। সে আমাকে ভালোবেসেছে সুখে-দুঃখে, রাজদ্বারে-শ্মশানে আমাকে সঙ্গ দিয়েছে, সে আমাকে চলার পাথেয় জুগিয়েছে। তার বন্ধুত্ব আমাকে সৌভাগ্যবান করেছে। অথচ আশ্চর্য! সুবর্ণ এখন আমার কেউ-ই নয়। ওকে বন্ধু বলতে আমি শিউরে উঠি, ঘৃণায় সংকুচিত হই। এবং বলাবাহুল্য, যে কতগুলো

পুরণো মূল্যবোধ আমার বিশ্বাসে স্থায়ী আসন দখল করেছিলো তার অন্যতম 'বন্ধুত্ব'। সে বন্ধুত্বে আর আমার আস্থা রইলো না। আমি অতঃপর আমরণ নির্বান্ধব থাকবো।

এই যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, যা আমরা অনেক মূল্য দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলাম, গড়ে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেছিলাম, সে বন্ধুত্ব, তাও ভাঙলো সম্পর্কের জটিলতায়। সেখানেও মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো সম্পর্ক।

প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার কথা বলি, এটা তোমার স্বার্থ সম্পর্কিত। সেই যে অরুদি আর তোমার অসবর্ণ বিয়ের ব্যাপারে অরুদির দাদার মতামত কি, আমাকে জানার জন্যে পাঠিয়েছিলে; যাতে শানুদা দ্বিরুক্তি না করে সম্মতি জানিয়েছিলেন, তোমরা ভেবেছিলে শানুদা আধুনিক এবং মনোভঙ্গীতে প্রগতিশীল বলেই এমন সহজ সমর্থন সম্ভব হয়েছে। আসলে মোটেই তা নয়। সেদিন শানুদার ব্যবহার আমার দৃষ্টিকে বার বার আকর্ষণ করছিলো। আমি স্পষ্টই সব দেখলাম। আর সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানো, শানুদা হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলেন। দেখলাম মিত্তিরদের মেজ মেয়েটা, যে বিধবা হয়েও কুমারীর মতো চলা-ফেরা করে, শানুদা তাকে ভালোবাসে, এবং মেয়েটাও। এবং শুনে চমকে ওঠো না, ওরা ইতিমধ্যে নাকি বিয়েও সেরে ফেলেছে।

এও বা কেন, সেদিন বিলুদের বাড়িতে শুনলাম, ওদের সেই ছোকরা চাকরটা, যে প্রথম প্রথম ভালো কথা শুনেও ফোঁস করে উঠতো, গালাগাল দিলে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিতো, সেই গোলকনাথ এখন নাকি ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। হাজার বকলেও, গালি দিলেও সে ঘুণাক্ষরে চাকরি ছাড়ার কথা বলে না। বিলুর বাবা কাকা তো ভীষণ অবাক, এবং খুব খুশিও। এখন চাকর জোটানো, এবং ভালো চাকর, খুব তো সোজা নয়?

গোলকনাথের স্বভাবের এত বড়ো পরিবর্তন কি করে সম্ভব হলো? বিলু আর বিলুর বোনেরা কি গোলকনাথকে আর কটু কথা বলে না? বকে না?

বলে, কটু কথা বলে, বকেও। তবুও গোলকনাথ চাকরি ছাড়বে না, ছাড়তে পারবে না।

তুমি অস্বস্তি বোধ করছো। করা স্বাভাবিক।

যে অবিচ্ছিন্নতা মনকে টানে, ঘটনাকে দানা বাঁধিয়ে কাহিনীতে পরিণত করে, কাহিনীর নায়ককে দেয় চারিত্রিক সম্পূর্ণতা, আমি তার কিছুই তোমাকে ধরে

দিতে পারছি নে। এ যেন বনের পথে চলতে চলতে হাত বাড়িয়ে তুলে নেওয়া হরেকরকম ফুল, কোনোটার স্পষ্ট পরিচয় জানি নে—কেউ বা গন্ধে আকর্ষণ করছে, কেউ বা রঙে। কারও বা পাপড়ির বৈচিত্র্য মন কাড়ছে, কারও সহজ লালিত্য। এবং আমার সঞ্চয়ী মন সঞ্চয়ে যেটুকু কালক্ষয় করেছে, সেগুলোকে মালায় গাঁথতে, তাদের প্রত্যেককে সম্পূর্ণতা দিতে ততটুকু সময় দিতে পারছে না। তাছাড়া শত সময় দিলেও ওরা সম্পূর্ণতা পেতো না, যেহেতু বহিরঙ্গে যে পরিচয়, অন্তরঙ্গে তার পরিচয় হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে বস্তু জগতের কোনো কিছুকেই পরিপূর্ণভাবে জানা যায় না, হোক সে ফুল, হোক সে মানুষ। এমন কি যে-আমি আমার আজন্মের পরিচিত—সত্যি বলতে কি, তাকেও পরিপূর্ণ জানা অসম্ভব। তার সব ইচ্ছে অনিচ্ছে কি আমি বুঝি ? তার সব দাবি-দাওয়া কি আমার পরিচিত ? সহস্রবার বোঝার ভান করতে পারি, কুশলী কাহিনীকারের মতো নিজের অভিজ্ঞতাগুলোকে সুনির্বাচিত করে সাজিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তাতে যে স্পষ্ট হবে—সে কি আমি ?

আসলে আদ্যন্ত আমরা কাউকে চিনি নে, পরকে নয়, নিজেকেও নয়। তাই আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্তই আপেক্ষিক. কোনো মন্তব্যই শেষতম নয়। সব কিছুই পরিবর্তন সাপেক্ষ, যেহেতু আমরা খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই অখণ্ড সিদ্ধান্ত করি। এবং সে সিদ্ধান্ত মেকি হতে বাধ্য। নইলে গতদিনের নীতিনিয়ম আজ অচল হয়ে যায় কেন ? কালকের বিশ্বাস-মূল্যবোধ আজ অর্থহীন হয়ে পড়ে কেন ?

আগেই বলেছি জীবন সরলরেখা নয়, জলরেখাও নয়। জীবন সংখ্যাহীন জটিলতার সহস্র-চক্র এক ব্যূহ। যাতে আগমন ও নির্গমনের দুটি দ্বার আছে মাত্র, তাছাড়া আর সবটাই সংখ্যাহীন চক্রের আঁকিবুকি। কেউ জানে না, কে কখন কোথায় ঢুকে কোথায় চলে যাচ্ছে, অথচ বার বার মনে হচ্ছে সবটাই বুঝি বা জানার মধ্যে, চেনার মধ্যে। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় সবটাই ভ্রম, সবটাই মায়া। আসলে আমরা জানি না, চিনি না, তবু আমরা মরিয়া হয়ে চক্র থেকে চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছি। খাচ্ছি নয়, কে যেন আমাদের ঘুরিয়ে মারছে।

কিন্তু সে কে ?

ঋতু বলতো, ভগবান। আমার তাতে সায় ছিলো। অথচ সেই তাকে আমি চিনি নে, জানি নে। কোনোদিন তাকে দেখিনি। অথচ আশ্চর্য কি জানো অবয়বহীন তার অস্তিত্ব আমার চেতনায় স্পষ্ট ; সে যেন জ্বলে জ্বলে

নিঃশেষিত ধূপের সৌরভ, বাতাসে ভেসে আসা সুদূরে ফোটা কোনো সুরভিত ফুলের সুবাস।

এ বিশ্বাস আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। নইলে এই সনাতন সমাজে আমরা কিছুতেই টিকে থাকতে পারতাম না। তীব্র পাপবোধ আমাদের ক্রমে ক্রমে ক্লান্ত করতো, ঋতু মরতো। অথচ এখন আমি ক্লান্তিহীন, ঋতু জীবন্ত। আমরা জানি, স্পষ্টই জানি, যা কিছু আমরা করেছি, যা কিছু আমাদের জীবনে ঘটছে এতে আমাদের কোনো হাত নেই। সব 'তাঁর' ইচ্ছা।

গভীরভাবে ভেবে দেখো, ঈশ্বরের প্রয়োজনে নয়, আমাদের আত্মরক্ষার জন্যেই ঈশ্বরের প্রয়োজন কত অনিবার্য। কি নিদারুণ দরকারি।

সবাই যদি আমাদের মতো বিশ্বাসী হতো! যদি সবাই বিশ্বাস করতো আমাদের সমস্ত কর্মই ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত, আমরা তাঁর হাতের পুতুল মাত্র, ভেবে দেখো এতে কত জটিলতার সহজে ইতি ঘটতে পারতো। কত সরল হয়ে যেতো সব কিছুই।

জানি তা হবার নয়, কারণ দুঃখ দেওয়া এবং পাওয়া মানুষের স্বভাবে। দুঃখ না দিলে সে সুখ পায় না, দুঃখ না পেলে জীবন বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ে।

আমরা সত্যই দুঃখবাদী!

আমরা যে দুঃখবাদী তাতে আর সন্দেহ কি? এই আমার কথাই ধরো? কি এমন খারাপ ছিলাম? ঋতুর ভালোবাসা হারিয়েছি, ভালো কথা, কিন্তু সুমনা, প্রীতি তো কৃপণতা করেনি। সুমনা তার শুদ্ধ কৌমার্য আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছে, তার মৌন ভালোবাসাকে আমিই তো মুখর হবার প্রশ্রয় দিয়েছি, প্রগলভ হবার মত উচ্ছলতা জুগিয়েছি। প্রীতির মার্জিত মনকে, সূক্ষ্ম চিন্তাধারাকে আমিই তো দিনে দিনে স্থূলতা দিচ্ছি, এবং তার মসৃণতাকে এবড়ো খেবড়ো আঁচড়ে খস্‌খসে করে ছাড়ছি।

ঋতুর আগেও আমি অনেকের ঘনিষ্ঠ হয়েছি; সুমনা, প্রীতি ছাড়াও ভবিষ্যতে আরও অনেকেব সঙ্গ আমি পাবো। এবং আমি জানি, গতদিনের অভিজ্ঞতায় আমি জেনেছি, প্রতিটি ঘনিষ্ঠতা আমাকে দুঃখ উপঢৌকন দেবে, আমিও দেবো। তা হলে?

সুমনা এখন দুঃখ পাচ্ছে। আমি এখন প্রীতিকে নিয়ে গল্প লিখছি। সুমনা যদি ঘুণাক্ষরেও জানে, যদি সে টের পায়, তাহলে মাথার চুল ছিঁড়বে। অথচ

আমি জানি সে কিছুতেই উল্টে আঘাত আমাকে দিতে পারবে না, কারণ সে ভীষণ ভালো, ভীষণ লাজুক এবং চাপা।

তুমি ভাবছো বুদ্ধিমান আমি, বুদ্ধির জোরে বেঁচে যাবো। বিশ্বাস করো, মোটেই তা নয়। আমার দুঃখও অফুরন্ত। এই তো, গতকাল প্রীতি আসবে বলে কথা দিয়েছিলো, অথচ সে আসেনি। এই না-আসা যে কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক, তোমাকে কি করে বোঝাবো। আমি জানতাম প্রীতি এভাবেই ক্রমশ জটিলে যাবে। যেদিন থেকে আমি ওকে স্থূলতার দীক্ষা দিতে শুরু করেছি আমি জানতাম, সর্বনাশ আসন্ন।

প্রীতি আরও কুশলী হবে, আরও ছলনাময়ী। এবং সে চেষ্টা করবে জড়িয়ে জড়িয়ে আমাকে বাঁধার। যতক্ষণ আমার দমবন্ধ না হবে, ততক্ষণ সে আমাকে মুক্তি দেবে না। আমাকে অস্থির করে ছাড়বে।

স্থিরতায় আমার বিশ্বাস অল্প। কিন্তু প্রীতির দেওয়া অস্থিরতা আমি কি সহজে মেনে নেবো? না, কখনো নয়। এবং হলপ করে বলছি এর জন্যেই আমাকে অপরিমিত দুঃখ পেতে হবে। আমি দুঃখে—তাতানো কড়ার উপরে ছড়িয়ে দেওয়া ধানের মতো পলকে খই হয়ে ফুটবো। বার বার ফুটবো।

তুমি হাসছো, হাসো। আমি কিন্তু স্বভাবকে সহজে ডিঙোতে পারব না। কেউই পারে না।

বাইরে ভীষণ অন্ধকার করে বৃষ্টি এলো।

ঋতু। বৃষ্টি তোমাকে মনে পড়িয়ে দিলো।

সেদিনও এমনি বৃষ্টি ছিলো ঋতু, তুমি কি যেন কিনতে বেরিয়েছিলে তোমার এক সঙ্গিনীর সঙ্গে। পথে আমার সঙ্গে দেখা। যথারীতি আমি পাশ কাটাচ্ছিলাম। যদি না ডাকতে? তাহলে, তাহলে ঋতু আমাদের ভালোবাসার ইতিহাস কবে সমাপ্ত হয়ে যেতো, আমি আমার অহঙ্কার নিয়ে সসম্মানে বেঁচে যেতাম। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্য, তুমি ডাকলে। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, মুখোমুখি। ক-ত-দি-ন পরে আমাদের দেখা হলো বল তো? ঠিক তিন মাস পরে।

সেই লাল শাড়িতে তোমাকে কী ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিলো! মনে মনে গর্ব হচ্ছিলো খুবই, যখন পথ চলতি যুবকগুলো আমার দিকে ঈর্ষার দৃষ্টি বার বার ছুঁড়ে দিচ্ছিলো। যখন তোমার বান্ধবী আমাকে দেখে প্রথমে

একটু অবাক হয়ে হঠাৎ উচ্ছল হয়ে উঠলো। তারপর আমি, তুমি, তোমার বান্ধবী অনেকটুকু পথ একসঙ্গে ঘোরার পর যখন আমি তোমাকে একলা আমার সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব করলাম, তখন তুমি ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলে, ভীষণ বিব্রত। তোমার বান্ধবী সসঙ্কোচে সরে পড়লো। আমরা এভিন্যু ছেড়ে গলিতে ঢুকলাম।

আর, ঠিক তখুনিই কোনো জানান না দিয়ে আকাশ কালো-করা বৃষ্টি নামলো। আমরা ভিজতে ভিজতে একটা বাড়ির বারান্দায় উঠে এলাম। সে বারান্দাটা কোনো একটা স্কুল বাড়ির।

ঋতু! এত পরেও সে বারান্দার স্মৃতি আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি। প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভাব, ভঙ্গী। সামনের পলেস্তরা-খসা বাড়ির থেকে একটি বয়স্কা মেয়ে আমাদের দেখছিলো, বিড় বিড় করে কি যেন বলছিলোও। দু-একটা কথা কানে আসেনি তাও নয়, কিন্তু সেগুলো দ্বিতীয়বার উচ্চারণেরও অযোগ্য।

একটু পরে একজন বয়স্কা মহিলা এসে দাঁড়ালেন, হয়তো মেয়েটির মা। কি যেন বললেন। তখন আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তোমার আমার দুজনেরই কাপড়-চোপড় ভিজে জবুজবে, এবং তখন অন্ধকার আরও ঘন, যদিও বৃষ্টি কমে গিয়েছিলো, মেঘ নেমে এসেছে নিচে, বেলা যায় যায়।

আমাদের তখন ভীষণ কথায় পেয়েছে। সে কত কথা। তুমি আমার বিরুদ্ধে বার দশেক অভিযোগ করেছো, যেহেতু তোমার দৃঢ় ধারণা, আমি ভীষণ সন্দেহপ্রবণ। এবং এও বলেছো, আমি নাকি দূরে সরে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ করে জানিয়েছো, সংসারে বিশ্বাস করলে ঠকতে হয় এ জানতে না, আমার ব্যবহারেই প্রথম জানলে।

ঋতু! সংখ্যার প্রথমটি ছাড়া পরবর্তীগুলো নিশ্চয়ই তোমার অপরিচিত। নইলে কি করে অত সহজে, সব ব্যাপারে তুমি 'প্রথম ভালোবাসো' 'প্রথম জানো'!

আমি কি তোমার ষষ্ঠ অভিজ্ঞতা নয়? নাকি তারও বেশি?

অথচ তারপরও তুমি বলবে 'প্রথম'। বলতে দ্বিধা নেই ঋতু, এই ছলনাই আমার সর্বনাশ করেছে। চতুরা তোমাকে আমি আরও গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললাম। সেদিন তুমি ভীষণ উচ্ছল হয়ে উঠলে। আমরা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে, ঝমঝমিয়ে নামা বৃষ্টিতে বেধড়ক ঘুরে বেড়ালাম

গলিতে, কানাগলিতে, লেনে। সেদিন মনে হয়েছিলো আমরা মহানগরীর ভিড় ছাড়িয়ে অন্য কোথায় যেন চলে গেছি। সে কি নিদারুণ নির্জন পথ, কোথাও কেউ নেই, কিচ্ছু না। মনে হয়েছিলো, আমরা দুজনে একলা একলা অনেক দূর চলে এসেছি, কোলাহল ছাড়িয়ে, কলঙ্ক ছাড়িয়ে, অনেক দূরে। চারিদিকে যেন বিগলিত অন্ধকার গলে গলে পড়ছিলো, হাওয়ায় হাওয়ায় শোভন ফুলের সুবাস।

ক্রমে অন্ধকার আরও ঘন হলো। আমরা ভবিষ্যতে মিলিত হবার প্রতিশ্রুতিতে বিচ্ছিন্ন হলাম।

সেদিন সারারাত বৃষ্টি পড়েছে। অঝোরঝরণ বৃষ্টি। আমার মনেও।

পরদিন সব ভাসলো, পথ-ঘাট, আমার মনও। সেই হাঁটু ছাড়ানো জল ঠেলে আমি তোমাদের বাসায় গেলাম। কী আশ্চর্য! বাইরের দরজায় শেকল তোলা, জানালা বন্ধ।

আমি বাড়ানো হাত গুটিয়ে নিলাম।

এত জলে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ঋতু? কোথায়?

পরে আমি জেনেছিলাম সবই, ইচ্ছে করেই সে জানার কথা তোমার কাছে গোপন করেছিলাম। বললে কি হতো?

কিছু না ঋতু, কিচ্ছু না।

আমি জানি তোমার স্বভাবের বিষ তোমাকে মাতাল করেছে, আমার স্বভাবের জ্বালা আমাকে উন্মত্ত।

ঋতু, আমাদের আরও দূরে যেতে হবে। অনেক দূরে।

হঠাৎ বৃষ্টি এসে সব এলোমেলো করে দিলো। এবং সে সুযোগে কয়েক কাহন করে তোমাকে ঋতুর আর আমার ভালোবাসার একটি পর্বের কথা শুনিয়ে দিলাম। তুমি নিশ্চয়ই বিরক্ত হচ্ছো, কিন্তু উপায় নেই, বৃষ্টি আমাকে বিভ্রান্ত করলো যে! নইলে স্বভাবের ধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্টত কিছু তত্ত্বকথা তোমাকে অবলীলায় শোনানো যেত। তুমি শুনতে, যেহেতু, অমৃতং বালভাষিতম্।

আমার মধ্যে একজন ছেলেমানুষ আছে, না? সেদিন প্রীতিও বলছিলো। কথা উঠেছিলো অপরূপ বোসকে নিয়ে, শিল্পী হিশেবে যত না, মেয়েদের মহলে খ্যাতি তার চেয়েও বেশি।

প্রীতি জিজ্ঞেস করেছিলো, উনি লোক হিশেবে কেমন ?

একটু হেসে জানিয়েছিলাম, ভালো, তবে ভীষণ ছেলেমানুষ।

তাই নাকি ! প্রীতি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলে আর আপনি ?

আমি ?

দুজনেই হো হো করে হেসে উঠেছিলাম।

আমার ছেলেমানুষী প্রীতির পছন্দ। যেমন পছন্দ করতো ঋতু।

অবশ্যই প্রীতি ঋতুর মতো নয়। ঋতুকে প্রথম পরিচয়ের দিনই হঠাৎ চুমু খেয়ে অবাক করে দিয়েছিলাম ; আর প্রীতিকে চুমু খাবার কথা ভাবতেই পারি নে। সে আমার ছেলেমানুষীতেই এখনও বুঁদ হয়ে আছে, যে আমাকে বয়স্ক হতে দিতে অরাজী। অবশ্য চেষ্টা যে করিনি তা নয়।

প্রীতি ! চুমু না খেলে ভালোবাসা গভীর হয় না।

তবু প্রীতিকে আমি চুমু খাবো না। ও খেতে দেবে না।

প্রীতি, স্তাঁদালের ভালোবাসার থিওরী বড্ড পুরণো। অবশ্য সবটা পুরণো নয়, অংশ বিশেষ। যেমন এক নম্বর admiration এখনও নোতুন ; এবং সত্য। কিন্তু দু নম্বর One says How delightful it would be to kiss and be kissed ! etc. এ একেবারে পুরণো। চুমু খেয়ে চুমু পেয়ে কি হয় ? বরং আমি তিন নম্বর (Hope) এ স্থির থাকবো। যদি (চার নম্বর Love is born) প্রেমের জন্ম হয় ! তারপরের crystallization (প্রথম ও দ্বিতীয়) এবং সন্দেহের সূত্রপাত ইত্যাদির কথা ভবিষ্যতে ভাবা যাবে। অবশ্য এ সব কোনো ফরমুলা ধরে হয় না, তবু বিশ্বাস করতে মন যায়, কেন না পুরণো চাল ভাতে বাড়ে এমনি একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। যেমন প্রচলিত আছে, পুরণো বউ পুরণো ঘিয়ের মতো, বাতে ব্যথায় উপকারী।

প্রীতি ! আমি আমার স্বভাবকে সংযম শিক্ষা দেবো। তুমি তো তাই-ই চাও, না ? আমি তাই-ই করবো। তোমার চাওয়াকে মিথ্যে হতে দেবো না। কিছুতেই না।

প্রীতির প্রীতি পাবার জন্যে আমি আমার স্বভাব পাল্টাবো তুমি বিশ্বাস

করো? জানি, তুমি করো না। তুমি জানো, চেষ্টা করে স্বভাবের ধর্ম বদলানো যায় না, জোর করেও নয়। স্বভাব পাল্টাবে স্বভাবের নিয়মে, দিনে দিনে, মাসে, বছরে, ক্রমান্বয়ে। এবং সে পরিবর্তন এত সূক্ষ্ম যে প্রথমে কিছুতেই নজরে পড়বে না, তার কাজ গোপনে গোপনে; হঠাৎ একদিন সবাইকে চমকে দিয়ে নোতুন হয়ে উঠবে। তখন তুমি অন্য একজন। রত্নাকর তখন বাল্মীকি।

সে কি সবার জীবনে সম্ভব?

নিশ্চয়ই সম্ভব, নইলে আমরাই যে মিথ্যে হয়ে যাই। ভেবে দেখো, কোথা থেকে আমরা আসছি। বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের বর্ণাশ্রমের কঠোরতা থেকে, পিতামহের কৌলিন্যের সনাতনী কুসংস্কার ছাড়িয়ে, আমরা যেখানে এখন এসে দাঁড়িয়েছি, স্বভাব অপরিবর্তনীয় হলে সে কি সম্ভব হতো? অবশ্যই এ সমস্ত জাতীয় স্বভাবের প্রশ্ন। ব্যক্তি স্বভাবেও পরিবর্তন আছে, যদিও তা অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম। যেমন ধরো, একালের একজন সভ্য, শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে প্রকাশ্যে কোনো নারীর কেশাকর্ষণ, অথবা বস্ত্রহরণ কি সম্ভব? অথবা আমরা কি ভুলেও ঋষি উদ্দালকের ঔদার্যের অধিকারী হতে পারি? না কি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, যে, স্ত্রীলোক হচ্ছে গাভীর মতো, শত পুরুষ গমনেও তাদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবার নয়?

আসল কথা কি জানো, সভ্য মানুষ পরিবর্তনে ভীত নয়। পরিবর্তনকে স্বাগত জানানোর ঔদার্য হলো সভ্যতা। বর্বরতা পরিবর্তনে ভীত; আঁকড়ে থাকতেই তার সার্থকতা।

আমরা কি বর্বরদের বংশধর নই?

অপেক্ষা করো, স্পষ্ট করছি।

তুমিও জানো, আমিও জানি, ইতিমধ্যে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। সেই ছায়াচ্ছন্ন, ঘুঘুডাকা গ্রামীণ দুপুর, লতাকুলের ঝোপ, ঘেঁটুফুলের বন, কেয়া ঝাড়, খেয়াঘাট, ইষ্টিশান ছাড়িয়ে অনেক দূরে। কখন কি ভাবে, কি করে এসেছি আমরা স্পষ্ট জানি নে। যদি আমরা প্রত্যেকে সহস্রাক্ষ হতাম, যদি দূরদর্শিতার যথেষ্ট খ্যাতি আমাদের থাকতো, তাহলে আমরা স্পষ্ট জানতে পারতাম কি করে আমরা এতদূর এসেছি, এবং বুঝতে পারতাম দূরে আসার সম্যক তাৎপর্য। যেহেতু আমরা সহস্রাক্ষ নই, যেহেতু আমাদের

দূরদর্শিতা নেই, সেহেতু মেঠো পথ আমাদের আজও হাতছানি দেয়, মেঠো ঘরের শান্তি আমরা প্রতি মুহূর্তে কামনা করি, মেঠো মণ্ডপের স্মৃতি আমাদের অহরহ বিব্রত করে। অথচ সেই মেঠো পথ ঘর মণ্ডপ আমাদের জীবন থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে। আমরা জানি নে কবে কখন শহর আমাদের গ্রাস করেছে, সুদূর গ্রামকেও। এখন গ্রাম আর অবশিষ্ট নেই, সবটাই বুঝিবা শহরতলী। মেঠো পথ ঘর সব উধাও ক্রমে ক্রমে ; মেঠো মানুষও যায় যায়। হঠাৎ যদি কোথাও নজরে আসে ভাঙা কুঁড়ে, কুঁজো চালাঘর, ওরা দিক্‌ভ্রষ্ট, দিশেহারা। সামান্য ঝড়েই মিলিয়ে যাবে। তবু স্মৃতি প্রতারক, এবং তাই নাগরিক আবহাওয়ায় প্রাত্যহিক জীবনী শক্তি সঞ্চয় করেও আমাদের মন এখনো প্রবাসী। গ্রামীণ মন, গ্রাম্য মানসিকতা আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে তাড়া করে ফেরে, শত চেষ্টাতেও আমরা আঠার-উনিশ শতকের কি তারও আগের সংস্কারের বাঁধন ছিঁড়ে বিশ শতকের মহানগরীতে স্পর্ধিত চলা-ফেরা করতে পারি নে। আমাদের বাধে।

এই তো আমাদের মানসিকতা! বল্লালী অত্যাচার, ঠাকুর পুরুতের সাত কাহনী বিধান, জ্যোতিষের মাদুলী কবচের নিদান আর শাস্ত্রের সহস্র নিষেধ, অথর্ব বৃদ্ধদের সংখ্যাহীন অচল নীতি উপদেশ এখনও আমাদের রক্তে-মজ্জায়। এখনও যাত্রাকালে পাঁজি দেখি, টিকটিকির ডাক শুনি, মেনে চলি শত সহস্র বিধি-বিধান। অথচ আমরা বাস করছি আধুনিক এক মহানগরীতে যেখানে সভ্যতার মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি কি ভীষণ প্রখর। কি তীব্র সে দাহ, কি দুরন্ত তার তাপ! অথচ আমরা এখনও হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি। কোথায় হারিয়ে এসেছি গতদিনের সমাজ, স্বজন, কুলাচার ; তবুও শহুরে পায়রা-খোপে তার উৎপাতের ইতি নেই। এবং আমাদের সম্পত্তির বোধ আজও তেমনি আদিম, আমাদের স্খলন-পতনের শাস্তি তেমনি অমানুষিক, নীতি-নিয়মের মান্ধাতাই ধ্বজা এখনও পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে মাথাব ওপরে।

দোহাই তোমার, আমাকে দিয়ে বিচার করো না। কারণ আমার চিন্তা আমি নয়। আমি পরিবেশ পারিপার্শ্বিকের চাপে ভ্রষ্ট, কিন্তু আমার চিন্তা নয়। আমার চিন্তা আমাকে নিয়েও বটে, আমাকে ছাড়িয়েও বটে।

বরং সমরের কথা বলি।

বিমলা সমরের স্ত্রীর নাম। ওর বিদ্যে, ষষ্ঠমানেরও নিচে। কিন্তু তার চলন, বলন, ব্যবহার, এমন কি তার রুচি প্রসাধনপটুতা যে কোনো আধুনিকার

সমপর্যায়ের। ভুলেও মনে হবে না সে স্বল্পশিক্ষিতা, বোকা, অথবা গেঁয়ো। এবং সে তার প্রাক্-বিবাহিত জীবনে তিনজনকে ভালোবেসেছিলো। একজন তাদের প্রতিবেশী, একজন তার বৌদির পরিচিত, অন্যজন পারিবারিক সম্পার্কিত। এমন কি সে একজনের সঙ্গে পালিয়ে যাবার সাহসও সঞ্চয় করেছিলো, কিন্তু যে মুহূর্তে শুনেছে সে দুষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত সে মুহূর্তে সে নিজেকে সংযত করেছে। এবং জানিয়ে রাখি, বিমলার বয়স এখন একুশ।

একুশ বছরের একটি মেয়েকে সমর বিয়ে করেছে তিরিশ বছর বয়সে। যদি ধরা যায় বিমলার দেহবোধের জন্ম হয়েছে বারোয়, তাহলে ন' বছরের তার ইতিহাস আছে। এবং সে ইতিহাস আগেই বলেছি।

সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানো, বিমলার ভালোবাসার কথা জেনেও সমরের মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ হয়নি, কারণ তিরিশ বছরের জীবনে সমরের ইতিহাসও তো স্বল্প নয়। কোন সুবাদে সে তার স্ত্রীর কাছে, যার বয়স একুশ, তার নিষ্কলুষ কৌমার্য দাবি করবে ?

কিন্তু আমরা করি। আমরা এমনই অন্ধ যে নিজের শতচ্ছিদ্রতা সত্ত্বেও পরের নিশ্ছিদ্র নিটোলতা দাবি করি। কেন করি ?

অথচ ইতিমধ্যে হিন্দুর বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের স্বীকৃতি পেয়েছে। ধরা যাক, রেণু নামের একজন মহিলা যিনি দর্শনে এম, এ, পাশ করে কোনো কলেজে লেকচারার হয়েছেন। তাঁর অতীত ইতিহাস উহ্য থাক, হঠাৎ তিনি বিয়ে করলেন একজন ভদ্রলোককে ভালোবেসে। তাঁদের দুটো ছেলেমেয়ে হলো, এবং অনিবার্য কারণে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো।

কোর্ট বিচ্ছেদের অনুমতি দিলো। ছেলে-মেয়ে দুটি রইলো বাপের হেপাজতে, ভদ্রমহিলা আরেকজনকে বিবাহ করলেন। অতঃপর প্রশ্ন হলো দ্বিতীয় স্বামী ভদ্রমহিলার কাছে কি সেই নিশ্ছিদ্র নিটোলত্বই দাবি করবেন ? কিন্তু সে কি করে সম্ভব, আগের স্বামীকে উনি যে দু-দুটো সন্তান উপহার দিয়েছেন।

বিনা দেহদানে কি জননী হওয়া সম্ভব ?

তাহলেই প্রশ্ন, সেই সনাতন নারীদেহের সংস্কার এ ক্ষেত্রে কতটুকু প্রযোজ্য ? আর সেই সংস্কারই যদি ভাঙলো, পুরণো সমাজ ব্যবস্থার অবশিষ্ট থাকে কি ? তবু আমরা সতী নারীর পাণি-পীড়নের আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করবো, নিজের বিকৃত রুচি সত্ত্বেও অন্যের কাছে শুদ্ধ রুচি দাবি করবো। আমাদের আকাঙ্ক্ষা

সত্যিই অপরিমিত। আমাদের ইচ্ছের বুঝিবা পরিধি নেই।

আসল কথা কি জানো, নীতিবাগিশদের কবলিত হয়ে আমরা সহজাত প্রবৃত্তি-গুলোকে বিকৃত করেছি দিনে দিনে, তারপর তাদের পরিচিত করেছি রিপু হিশেবে, এবং চেষ্টা করেছি দমনের। কিন্তু তাতে রিপু দমিত হয়নি, আজ বিপুল বিক্রমে সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমরা ঢেকে ঢুকে তন্ত্রে-মন্ত্রে, যোগে-যাগেও থামাতে পারিনি। আগে যারা ছিলো আমাদের হাতের পুতুল, তারা ক্রমে আমাদের কবলিত করছে।

আমি বলি, এ ভালোই। এর প্রয়োজন ছিলো, প্রয়োজন আছে।

পাড়ি ভেঙে ভেঙে পাড়ি জমিয়ে এতদূর ছুটে এলাম কেন বলো তো? আমি কি স্পষ্ট করতে পেরেছি আমার বক্তব্য? হয়তো কেন, সত্যিই পারিনি। এ আমার তোমার, সবারই দুর্ভাগ্য। আমরা যে এক নিদারুণ সর্বনাশা যুগে বাস করছি, যে যুগে মরণ পায়ে পায়ে ঘুরছে। আমাদের কান্নার জলে আমাদেরই চলার পথ পিচ্ছিল। মুহূর্তের অসতর্কতায় অনিবার্য মৃত্যু, অতি সতর্কতায় সচলতাই উধাও! অথচ আমাদের যেতে হবে। সে কোথায়?—সে কথা আমরা কেউই জানি নে।

যদি আমরা ঘরে থাকতাম তাহলে ঘরের পরিসরে নিশ্চয়ই মানিয়ে যেতাম, যেমন মানিয়ে গেছেন আমাদের পিতা, পিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহেরা। যদি জোরের সঙ্গে বাইরে বেরোতে পারতাম, নিশ্চয়ই তাঁদের উল্টো কিছু একটা হয়ে যেতাম। কিন্তু আমরা যে অসহনীয় অস্থিরতায় ঘরে-বাইরে ছুটোছুটি করেছি, করছি।

হয়তো এই-ই আমাদের নিয়তি। হয়তো এমনি করেই আমরা আমরণ ছুটবো, ছুটোছুটি করবো। কোনো স্থির লক্ষ্যে আমরা হয়তো কোনোদিনই পৌঁছতে পারবো না। আমরা মরবো।

আমি কি আমার অভিজ্ঞতাকে, আমার যন্ত্রণাকে অতিরঞ্জিত করেছি? আমি জানি না।

সেদিন কোথায় পালালে বলো তো? আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তোমার টিকিটি দেখতে পেলাম না। এমন অপ্রস্তুত কেউ কাউকে করে? তোমাকে ভালোবাসতাম, এই সুবাদেই কি তোমার একরাশ ক্ষ্যাপামি আমাকে দিয়ে গলাধঃকরণ করালে? অথচ আমি এসেছিলাম অন্য প্রয়োজনে, তুমি সেটুকু বলার ফুরসৎ না দিয়ে এক গাদা কাগজ-পত্তর পড়তে বসিয়ে কোথায় সরে পড়লে। আর ফিরলে না। ভাগ্যিস্ তোমার চাকরটা ছিলো, নইলে আরও কতক্ষণ যে অপেক্ষা করতে হতো? যাক্ ইতিমধ্যে যদি সম্ভব হয় একবার এসো। তোমাকে আমার ভীষণ প্রয়োজন। বরং স্পষ্টই বলি, আমার কিছু টাকার দরকার। ধরো শ' খানেক। সম্ভব হলে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

তুমি আমার ব্যবহারে দুঃখ পেলে। কিন্তু কি করি, টাকার যে আমার বিশেষ প্রয়োজন। এবং সে-টাকা তোমার কাছেই পেতে পারি, এ বিশ্বাসেই সেদিন তোমার কাছে গিয়েছিলাম। তুমি পালালে, আমার মনের কথা মনেই রইলো, বলা হলো না। অথচ না বলতে পারার জন্যে আমি ভীষণ অসহায় বোধ করে-ছিলাম। ভেবেছিলাম, শেষ পর্যন্ত তুমি ফিরবে; ফিরলে না।

আমাকে নিয়ে তোমার বন্ধুকে লেখা চিঠিটা বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়েছি। বলতে দ্বিধা নেই, আমার সম্পর্কে তোমার মনোভাব আমার কাছে ভীষণ স্পষ্ট। তবু নির্লজ্জের মতো টাকার কথা লিখলাম, যেহেতু টাকার বিশেষ প্রয়োজন। তুমি দিতেও পারো, নাও পারো। এবং তোমার স্বভাব জানি বলেই লিখছি, তুমি খুবই দুঃখ পাচ্ছো আমার ব্যবহারে, এবং আরো পাবে। তবু সত্যি কথাগুলো স্পষ্টই বলি, তাতে হয়তো ভুল বোঝার অবসান হবে, হয়তো পরিচ্ছন্ন বিচারের পথ খুলে যাবে। এবং হলপ করে বলছি, তোমাকে খুশি করার জন্যে আমি একটি অক্ষরও লিখবো না, আমার অল্প বুদ্ধিতে, বিদ্যায় যেটুকু মনে হয়েছে শুধু তাই-ই তোমাকে জানাবো। তাতে যদি আমাকে নির্মম মনে হয়, যদি বোকা বলে প্রমাণিত হই, হবো; কিন্তু আমি মিথ্যে বলবো না। এবং এখানে বলে রাখি আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণার সবটুকু মিথ্যে নয়, অর্থাৎ অংশত সত্য। এর কারণ তুমি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কাউকে বিচার করোনি, করেছো নিজের চোখ

দিয়ে। তোমার নিজের শক্তির 'পরে তোমার প্রচণ্ড বিশ্বাস। কিন্তু শুভ, প্রচণ্ডতা মোটেই স্বাভাবিক নয়, এবং সেজন্যেই তোমার বিচারে প্রচুর ত্রুটি। তুমি যতটুকু সত্য বলেছো, মিথ্যে বলেছো তার ঢের ঢের বেশি। আসলে গলদ আছে তোমার দেখায়। বরং দ্বিধাহীন ভাবে বলি, তোমার দৃষ্টি এক চোখো হরিণের মতো। এ তো অত্যন্ত সত্যি যে, একই মুহূর্তে কোন কিছুরই দুপিঠ দেখা যায় না। তার জন্যে সময় হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে হয়। কিন্তু তোমার স্বভাবেই অধৈর্যপনা, ফলে একপিঠ দেখেই বস্তু বিচার করেছো, তাতে ভুল এড়ানো যায়নি। এ তোমার দোষ নয়, তোমার বহির্মুখী স্বভাবের দোষ। নইলে তুমি সেদিনের বৃষ্টি ভেজা বিকেলের ঘটনার পরের ঘটনাকে অমন ভাবে অর্থ করলে কেন?

আমি জানি নে, তুমি কার কাছ থেকে কি শুনেছো? এবং তোমার স্বভাব জানি বলেই গায়ে পড়ে ভুল শোধরানোর চেষ্টা করিনি। নইলে তোমাকে, তোমার ধারণাকে কিছুতেই অমন বিশ্রী সিদ্ধান্ত করতে দিতাম না। অথচ তুমি সব জানার বড়াই করতে ছাড়োনি।

আজ খুলে বলি।

সেই তো তুমি ট্রামে তুলে দিয়ে চলে গেলে। ঘরে ফিরলাম এক গা জল নিয়ে। কাপড় ছাড়া তখনও হয়নি; হঠাৎ বাইরে কড়া বেজে উঠলো। এমন ঝড় জলে কে এলো? মুখে বললাম, খোলা আছে। ঘরে ঢুকলো সদানন্দ। সদানন্দ আমার শ্বশুর বাড়ির চাকর। বললাম, এই ঝড় জলে?

সে বললে, বৌদিমণি, বাবু মশায়ের ভীষণ অসুখ। আপনাকে নে যাবার জন্যে এয়েছি।

সব তো বুঝলাম, কিন্তু এই ঝড় জলে?

বাবু মশায় বললে যে।

কি করবো ভেবে পেলাম না, তখনো ও অফিস থেকে ফেরেনি। অথচ সদা যা বললো, তাতে মনে হচ্ছে যাওয়া নেহাতই দরকার।

সদাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা কি বললে রে।

না! মা-ই ত আমাকে পাঠালে।

ও। একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, শুধু কি আমাকে যেতে বলেছে?

তা কেন বৌদিমণি। দাদাবাবু যাবে না?

অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সদাকে বললাম, তোর দাদাবাবু ফিরলো বলে। বরং তুই যা, বলিস্, রাত্রে যদি সম্ভব না হয় তো, ভোরে যাবো।

সদা চলে গেলো। ও ফিরলো যখন, তখন রাত দশটা। ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে। আমারও ঘুম এলো বলে। ও ঘরে ঢুকলো। খেতে বসলে বললাম সবই। ও বললো, তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যাবে, আমি যেতে পারবো না, অনেক কাজ। তাছাড়া—

সে একগ্রাস ভাত মুখে দিয়ে নিজের কোনো একটা কথা কৌশলে আড়াল করলে। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম সে যাবে না। কিন্তু আমিও যদি না যাই তাহলে সম্পর্কের সামান্য সুতোটুকুও চিরদিনের মত ছিঁড়ে যাবে। পরে শত চেষ্টাতেও তাকে জোড়া দেওয়া যাবে না। অথচ আমি এমন অঘটন চাই না, চাই নে।

পরদিন ও অফিস চলে গেলে আমি ছেলেমেয়েকে নিয়ে শ্বশুরের কাছে চলে গেলাম।

শুভ, তোমার যদি সামান্য ধৈর্যও থাকতো তাহলে ভেতরের দরজায় তালা তোমার নজরে পড়তো। তাছাড়া তুমি কেন ভাবলে না যে তোমার ভাষায় আমার মতো চতুরা মেয়ে অভিসারে বেরোবার সময় আর যাই কিছু করুক ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে বেরুবে না। বেরুতে পারে না।

শুভ, তোমার ধৈর্যহীনতাই তোমার যন্ত্রণা, তোমার দুঃখ। এবং বলি এই অধৈর্যপনা তোমাকে বার বার ঠকিয়েছে, আরও ঠকাবে। শুভ, ধৈর্য ধরতে শেখো।

আসলে মানসিক অস্থিরতা নিয়ে কিছুই হয় না। না বিচার, না উপভোগ। এ অস্থিরতা তোমার চিঠির ছত্রে ছত্রে। আরেকবার চোখ বোলালে তুমিই টের পাবে কত অসংলগ্ন ঘটনার আমদানি তুমি করেছো, কত সামঞ্জস্যহীন সিদ্ধান্তে তুমি উপনীত হয়েছো। এর কারণ তোমার মনের অস্বাভাবিক অস্থিরতা, তোমার প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতা। নইলে আরেকটু গভীরে গেলে তুমি স্পষ্টই বুঝতে যে তোমার দেখার মধ্যে অসুস্থতা যত, সুস্থতা তার সিকির সিকিও নয়। তাছাড়া তোমার মধ্যে আরও একটি বস্তুর অভাব অত্যন্ত প্রকট, তা হলো শ্রদ্ধা। দেখো, শ্রদ্ধার অভাবে কোনো কিছুরই যথার্থ বিচার সম্ভব নয়। এবং তোমার স্বভাব

অতি মাত্রায় রক্ষণশীল, তার প্রমাণ তোমার চিঠি। তার ছত্রে ছত্রে গতদিনের নিয়ম-নীতির প্রতি আনুগত্য স্পষ্ট। এবং একালের ভাঙনের জন্যে তোমার ক্ষোভ দুঃসহ এক যন্ত্রণায় তীব্রভাবে উচ্চারিত। উদারতার যেটুকু বর্তমান সেটুকুর সঙ্গে আশ্চর্য কুশলতায় যুক্ত হয়ে আছে একটি মাত্র শব্দ, তা হলো 'অগত্যা'। তোমার সিদ্ধান্ত অনেকটা সেই বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকের অনুকরণে, অর্থাৎ যখন সর্বনাশ উপস্থিত, তখন অর্ধেক ত্যাগ করো জ্ঞানীর মতো, বুদ্ধিমানের মতো। কিন্তু তা কেন? কেন তুমি একালের কোলাহলকে সর্বনাশা ভাববে? কেন, নিরুপায়ের মতো অর্ধেক ত্যাগ করার কথা তোমার চিন্তায় প্রশ্রয় পাবে? কেন, আমরা কি জলের তোড়ে ভেসে আসা খড়-কুটো?
তার আগে আমার কথা, আমার ভাবনাচিন্তার, আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। এ তো মিথ্যে নয় যে বয়স আমার তোমার চেয়ে কম হলেও অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে ঢের ঢের বেশি। তাছাড়া এদেশে তো প্রবাদই আছে যে, কুড়িতেই মেয়েরা বুড়ি। তার মানে হলো তোমাদের বুদ্ধির জন্ম হয় ষোলোয়, তোমরা বুড়ো হও ষাটে। আর আমরা জন্মের মুহূর্ত থেকেই বুদ্ধিমতি। তাছাড়া তোমার অভিজ্ঞতার অনেকটুকুই দেখা, বেশির ভাগই পরের জীবনের। আর আমার অভিজ্ঞতার বারো আনাই আমার জীবনের। ফলে তোমার অভিজ্ঞতার বারো আনাই খাদ, আমার কিন্তু চার আনা।
ইতিমধ্যে তুমি যদি ধৈর্য হারিয়ে থাকো, জানি তাহলে, তুমি ভুরি ভুরি মহাজনের অশ্রদ্ধেয় উক্তি জড়ো করে নিজেকে বোঝাবে যে নারীর উক্তি, তাদের বুদ্ধি, সবটাই প্রলয়ঙ্করী। এবং তাদের মস্তিষ্কে আর যা কিছু থাক জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি স্বল্প। কিন্তু দোহাই শুভ, একালের কথা ভেবে তুমি একটু স্থির থাকো, আমার কথাগুলো আমি সম্ভব মতো গুছিয়ে বলি। তাছাড়া তোমাদের কথার ষোলো আনা মূল্য যদি আমরা এতদিন ধরে দিয়ে আসতে পারি, তাহলে আজ যখন আমাদেরও কিছু কথা বলার আছে বলে মনে হয়েছে, কেন তোমরা সেগুলো পুরোণো সংস্কার বিসর্জন দিয়ে শুনবে না? আমরা মেয়েরাই তোমাদের ধারণ করেছি, লালন করেছি, পালন করেছি। সবচেয়ে বড়ো কথা, তোমাদের উর্ধ্বশ্বাস ছোটার ব্যস্ততায় মমতা দিয়ে স্নেহ দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে স্থিত হবার প্রেরণা জুগিয়েছি। এটুকু ঋণ কেন অস্বীকার করবে? যে অর্থে মাটির অস্তিত্বকে মানুষ অস্বীকার করতে পারে না, ঠিক সে-অর্থেই আমাদেরও তোমরা উড়িয়ে দিতে পারো না। উড়িয়ে দিলে তোমাদের আপন অস্তিত্বও

যে টান পড়বে। হয়তো আমরা মাটির মতোই, কর্ষিত না হলে শস্য সমৃদ্ধি অসম্ভব, কিন্তু মাটিরও একটি রীতি আছে। সব ঋতুর কর্ষণে সে সমৃদ্ধ হয় না, তার জন্যেই বর্ষাই প্রশস্ত। এটা মানুষ একদিনে বোঝেনি, দীর্ঘদিনে বুঝেছে। আমাদের সম্বন্ধেও সেই একই কথা, সময়ে আমাদেরও বুঝবে। কর্ষণের জন্যে কর্ষণ সে অমানুষিক। সে পরিশ্রম বৃথা, ব্যর্থ। অথচ আমাদের নিয়ে তোমরা তাই-ই করছো, দাঁতে দাঁত চেপে আমরা সে-সব অত্যাচার সহ্য করছি। কিন্তু আর অসম্ভব। তোমরাও তা টের পাচ্ছো না, তা নয়। সেই সমৃদ্ধি উধাও, সে-উর্বরতা আর অবশিষ্ট নেই।

শুভ, আমার কথা বলছি। চোদ্দ বছর বয়সে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম একটি বাইশ বছরের ছেলেকে। তখন কিই বা বুঝতাম ভালোবাসার? তখন সবে দেহের সীমায় স্পষ্ট হচ্ছে আমি ছেলে নই, মেয়ে। আমি পুরুষ নই, নারী। মনে তখনও পুরুষালী উচ্ছলতা, সেই বাধাবন্ধনহীন ছোটা। চোখে ছলনা নয়, সুতীব্র জ্বালার তির্যকতা। হঠাৎ সব এলোমেলো হয়ে গেলো। চারদিকের চোখ দেখি আমার উপরে। মা বললেন, ঢাকো; বাবা বললেন, ঢাকো; আত্মীয় স্বজন সবাই একবাক্যে দিলেন সতর্ক করে। এগার হাতি কাপড়ের পাকে পাকে আমার সব ঢেকে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টি হলো নরম, নম্র, উচ্ছলতার অবসান হলো। স্পষ্টই ঘোষিত হলো, আমি নারী। আমার ভূষণ লজ্জা। আর সেই লজ্জায় প্রথম আহত হলো প্রতিবেশী সুবল, যাকে আমি ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছি, যে আমার সঙ্গে একই স্কুলে পড়তো, একই ক্লাসে। তারপর দিদির দেওর কল্যাণ, সে তখন সবে স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। বয়স কত তার? ষোলো? ওকে আমার একেবারে ছেলেমানুষ বলে মনে হতো। এর পরের আসামী শঙ্কর, দাদার বন্ধু। তারপর এলো বাইশ বছরের যুবক প্রসাদ। সে আমাকে ভালোবেসে তার পদবী দিয়েছে, সামাজিক সম্মান দিয়েছে, তার ছেলেমেয়ের জননী হবার অহঙ্কার দিয়েছে। কিন্তু তার এই দানের কতটুকু মর্যাদা আমি দিয়েছি? তোমার ধারণা, আমি কিছুই দিইনি। কিন্তু শুভ, কিছুই যদি না দিয়ে থাকি সে আমাকে এখনও পত্নীত্বের আসনে বসিয়ে রেখেছে কেন? সে কি ওর দুর্বলতা, না কি মোহ?

শুভ, তুমি ওখানেই ভুল করেছো। বত্রিশ বছর বয়সেও ওর সৌন্দর্য দুচোখ মেলে দেখবার মতো। এখনও ওকে অবিবাহিত যুবক হিশেবে স্বচ্ছন্দে চালানো যায়। তাও বা কেন, ও যদি ইচ্ছে করে এখনও কয়েকটা মেয়েকে অনায়াসে

কুপথে নিয়ে যেতে পারে। ওর সৌন্দর্যে তেমন প্রলোভন স্বল্প নয়। দৈহিক সৌন্দর্য যদি উহ্য রাখো, তা হলেও আর্থিক যে সঙ্গতি ওর আছে তাও কম লোভনীয় নয়। সে তোমার মতো কবিতা করে না। যদি করতো, তাতে স্বচ্ছলতা নষ্ট হতো ঠিকই, আমি হয়তো খুশিই হতাম ; যেমন খুশি হতাম তোমার সঙ্গে মিশে। কিন্তু কি আশ্চর্য, ও এতো সুদর্শন তবু কবিতা করে না। এটা ওর ত্রুটি। ওর দ্বিতীয় ত্রুটি, ও বড্ড বেশী আত্ম-বিশ্বাসী। ওর বিশ্বাস যদি একটু কম হতো, ও যদি মাঝে মাঝে নির্ভর করতো, আত্মসমর্পণ করতো, আশ্রয় খুঁজতো অসহায়ের মতো, তাহলে আমি সৌমিত্রের সঙ্গে কিছুতেই মিশতাম না। ও ভীষণ স্বার্থপর। নিজেকে যদি সে আরেকটু কম ভালবাসতো, নিজের সুখের জন্যে সে যদি অতো লোভী না হতো, যদি সে আমার সুখের জন্যে আরেকটু মনোযোগ দিতো, পল্লবকে আমি সহজেই অপছন্দ করতে পারতাম।

শুভ, পল্লবকে তুমি ঠিক চেনো না। তার কথা তোমাকে বলিনি। সে আমাকে খুশি করার জন্যে অনেকটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছে। সে তোমাদের কারোরই মতন নয়। সে দেয়, নেয় না, দাবিও করে না—যদি দুঃখ পাই। আমাকে দুঃখ দিতে তার লাগে। সে তোমাদের ঠিক উল্টো। তার কথা থাক। হ্যাঁ শুভ, আমি আমার কথায় ফিরে যাই। এবং এখানে একটু করে জানিয়ে রাখি, প্রসাদ আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রেখো আমিও তাকে কম ভালোবাসি নে। কতটুকু বাসি, পরে বলবো। দোহাই তোমার, আমাকে অসতী, ভ্রষ্টা, বিশ্বাসঘাতিনী, এ সমস্ত বিশেষণ এ মুহূর্তে উপহার দিও না। একটু অপেক্ষা করো, আমি সাধ্য মত স্পষ্ট হবো। তার আগে আরেকটু গোড়ার কথা বলি।

প্রসাদ আমাকে ভালোবাসলো, আমিও। আগেই বলেছি, তখন ভালোবাসার কিই বা বুঝতাম ! সত্যিই তাই। তখন লুকিয়ে-চুরিয়ে যেটুকু মিশতাম, এবং মেশার ফাঁকে যেটুকু আদর কাড়তাম একে অন্যের, মনে হতো তাইই বুঝি ভালোবাসা। আসলে তার আগে কারও সাথে তো এভাবে মিশিনি, এতো কাছাকাছিও আসি-নি। তাই যখন বিয়ের প্রস্তাব দিলো প্রসাদ, তখন মনে হলো, আকাশ হাতে পেয়েছি। মনে হলো, আমার মতো সৌভাগ্যবতী সত্যিই দুর্লভ। কিন্তু বাধা এলো গুরুজনদের তরফ থেকে। তখন মনে হলো, আমি মরে যাবো, যদি প্রসাদকে হারাই। আর সত্যি বলতে কি সেদিনের সেই উন্মত্ত আবেগ যে

বিশুদ্ধ ভালোবাসা, একথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে এতটুকু কুণ্ঠা হয়নি আমার। আমার মনে হয়েছে এই-ই সে প্রেম, যে-প্রেম গল্পে উপন্যাসে দেখা যায়, যে প্রেমে আগুন জ্বলে, পাঁকে পদ্ম ফোটে। যে প্রেম জীবনে সবাই আকাঙ্ক্ষা করে।

আমি তাতেই মজে রইলাম। বাইরের কোলাহল আমাকে স্পর্শ করলো না, ঘরের হাঁক-ডাক আমি লাফিয়ে ডিঙোলাম। তারপর শুভদিন এলো অনেক অশুভকে সরিয়ে, অনেক অমঙ্গলকে সরাসরি অগ্রাহ্য করে।

আমরা ঘর পেলাম। সুখও।

কিন্তু তুমি তো জানো শুভ, কোন সুখই নিরবচ্ছিন্ন নয়। সে খণ্ড, সে বিক্ষিপ্ত। তাকে গুছিয়ে রাখতে গেলে সে এলোমেলো ছিটকে পড়ে ; গুছোনো অবস্থায় যদি বা কেউ পায়, তাকে ধরে রাখা যায় না। সে সমুদ্রের বালুর মতো, যতই মুঠোকে শক্ত করবে ততই পিছলে পিছলে ফুরিয়ে যাবে। আমাদেরও তাই-ই হলো, সে-সুখ বেশীদিন রইলো না। হারিয়ে গেলো। বরং বলা যায়, সইলো না। অবশ্য এ শুধু আমাদের ক্ষেত্রে নয়, সবারই জীবনে।

সে জীবনের কিছুটা স্পষ্ট করবো ? করি না। তোমার সাত-সতেরো যদি আমি নির্বিবাদে গলাধঃকরণ করতে পেরে থাকি, তুমি আমার সাত-পাঁচ কেন পারবে না ? পুরুষ বলে ?

দেখো শুভ, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের যেটুকু গড়ে উঠেছিলো, আমি জানি না, আমাকে তুমি কতোটুকু মূল্য দিয়েছো, কোন জায়গায় আমাকে দাঁড় করিয়েছিলে,—আমি কিন্তু সমানাধিকারের অহঙ্কার মনে রেখেছিলাম। যেটুকু বিনীত হয়েছি, সবটাই তোমার দেখাদেখি। একটুও বেশি বা কম নয়। এবং এখনও আমি সেখান থেকেই লিখছি, অতএব অসম্মান সহ্য হবে না, মনে রেখো।

সেই সুদূর ফুলশয্যার রাতের কথা প্রথমে বলি। সে রাতটার স্মৃতি এখনও স্পষ্ট মনে আছে। কারণ পরবর্তী জীবনের সমস্ত কিছুই যেন ওই রাতের ঝিনুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ছিলো। তখন স্পষ্ট চিনতে পারিনি, পরে পেরেছিলাম।

বেশি রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখতে ভরসা পায়নি কেউ, সবাই বলেছিলো ছোট্ট মেয়ে, ইতিমধ্যে কাহিল হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাড়াতাড়িতে নেমন্তন্ন বাড়ি

ফাঁকা হয়ে গেলো, আমাদের খাওয়া-দাওয়াও। ক্রমে সেই আশ্চর্য রাতের ঝিনুকের মুখ খুললো। আবছা আলোয় আমি চেষ্টা করলাম ঝিনুকের গভীরের সব কিছুকে নেড়েচেড়ে দেখতে। মনের কোথায় যেন অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা দুন্দুভির মত বাজছিলো, ফলে সব দেখা পরিচ্ছন্ন হলো না। কিছু পলকে দেখলাম, কিছু বাঁকা চোখে। দায়ী অবশ্য প্রসাদই। তার কৌতূহল এত বেশি যে, আনাড়ির মতো ফুলের প্রতিটি পাপড়িকে সে স্পর্শের আদিম আনন্দ দিতে চাইলে, কলংক, অবিচ্ছিন্ন উত্তাপ। তাতে ফুল খুশি হলো, ক্লান্ত হলো, এবং বিরক্ত। শুধু আমি নই, সেও। তারও মনে হয়েছিলো হয়তো, এটুকুর জন্যে এতো পরিশ্রম যেন বড্ড বেশি। আমার মনে হলো, বড্ড চড়া দাম দিয়ে আমরা ঠকেছি। যদিও এ মনে হওয়া স্বল্প স্থায়ী, তবু সত্য। অবশ্য তখনও আমরা মনের নামে, ফুলের নামে নাম রাখতে শিখিনি, দেহের দামে পাওনা গণ্ডা শোধ করেছি। সেই-ই হলো কাল। আমরা কোনোদিন আর মনের নাম রাখতে পারলাম না, ফুলের নামে নাম ধরে ডাকতে শিখলাম না। আমরা দেহের সেই অগভীর কুহকে পথভ্রষ্ট হলাম। আমরা উচ্চারিত হলাম প্রয়োজনে। শুধুই প্রয়োজনে। কখনও সন্তানের জননী হিশেবে, কখনও গৃহিণী হিসেবে, কখনও শয্যাসঙ্গিনী রূপে—এইমাত্র। সেও তাই।

আমাদের কথা হলো দেহ সংক্রান্ত, আমরা অপলক তাকিয়ে রইলাম দেহের দিকে, আমরা স্পর্শ করলাম দেহ, চিন্তা করলাম দেহ, ভোগ করলাম দেহ। দেহকে ছাড়িয়ে একটি পা ও আমরা এগোলাম না, দেহকে ভুলে মুহূর্তের জন্যেও বিচ্ছিন্ন হলাম না। পরবর্তী জীবনে তাই আমরা উভয়ে উভয়ের কাছে দেহ-সর্বস্ব হয়েই রইলাম, দেহাতীতকে স্পর্শ করা সম্ভব হলো না—বাধা হয়ে রইলো দেহ। বাঁধা পড়ে গেলাম দেহে।

শুভ, দেহটা সোজা সড়কের মতো সহজ। না শুভ, ঠিক হলো না, দেহ প্রত্যহের পরিচিত পরিবেশের মতো বৈচিত্র্যহীন। না, এও হলো না। শুভ, দেহ একটি ত্রিভুজের মতো, অনায়াস ও স্বতঃসিদ্ধ। না, না, হলো না, শুভ দেহের কোনো সংজ্ঞা নেই। দেহ এক কথায় বার বার ব্যবহারের অযোগ্য এমন একটা কিছু যা অভিজ্ঞকে সহজে ক্লান্ত করে, অনভিজ্ঞকে কোনো সান্ত্বনা দেয় না। দেহ একটি মূর্তিমান প্রগলভতা, যার কোনো সুরুচি নেই, যা বিরক্তিকর। না শুভ, আমি ঠিক ঠিক বলতে পারলাম না, পারবোও না। অথচ এই দেহের কতো না

প্রলোভন, কতো না আকর্ষণ। এই দেহকে ঘিরেই না আমাদের সমস্ত কথা কবিতার মতো দানা বেঁধে ওঠে, আমাদের জীবন শিখার মতো জ্বলে, আমাদের সমস্ত বৃত্তিগুলো ধূপের মতো পোড়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য, যেই-ই সহজলভ্য হলো অমনি সব নিঃশেষ, সমস্ত সমাপ্ত, সব কিছুর ইতি।

শুভ, ফুলশয্যার রাতে প্রথম আমরা দেহের উত্তাপে খুশি হলাম, ক্লান্ত হলাম, ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বামী নামক পুরুষের সঙ্গে ঘুমোনোর অনভ্যাসের ফলে ঘুম ভেঙে গেলো মধ্যরাত্রে। তারও তাই। ভাবলাম এবার মন কথা বলবে। বালাই ষাট! শেষ রাতেও সেই একেরই পুনরাবৃত্তি। শুভ আমার মনে হয়েছে এ অত্যাচার, কিন্তু তাকে জোর করে সরিয়ে খুশি হবার চেষ্টা করেছি। অবশ্য পরবর্তী জীবনে আমার সেদিনের সেই মনে হওয়াই সত্য হয়ে গেলো। সে-ধারণার আমূল পরিবর্তনের কোনো যুক্তি আমার মাথায় আসেনি। ঘুম ভাঙলে সে কী সুখ! সে কী ক্লান্তি। আঃ! সে সুখ কবে মরে গেছে অথচ সে ক্লান্তি আজো আমার কাটেনি। হয়তো কোনোদিন কাটবে না।

সত্যি বলছি শুভ, দেহ সম্পর্কিত সব কিছুই আমার পক্ষে ক্লান্তিকর। দেহ-ভাবনা আমাকে বিমর্ষ করে, বিষণ্ণ। তবু দেহকে বাদ দিয়ে আমি মূল্যহীন— তার প্রমাণ তোমরা। তোমরা প্রত্যেকেই কি আমার দেহকে ঘুষ হিশেবে চাওনি?

সে কথায় পরে আসছি। তার আগে আরও কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলি। তাতে আমি হয়তো যথেষ্ট স্পষ্ট হবো। ধরা যাক, আমার প্রথম মা হতে যাওয়ার আগের দিনগুলোর কথা।

সবে চৌদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পা দিয়েছি। কতটুকু আর অভিজ্ঞতা? হঠাৎ খবর পেলাম মা হতে চলেছি। আনন্দে আতঙ্কে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে বুঝি! ঠিক সে সময়ে ওর সঙ্গে ওর দাদাদের লাগলো ঝগড়া। এক বাড়ি মানুষ, সবাই ওর বিরুদ্ধে। দোষের মধ্যে সে সে-মাসের মাইনের টাকা থেকে আমাকে একটা শাড়ি কিনে দিয়েছিলো। তাও যে ও নিজের গরজে দিয়েছে তা নয়, দিয়েছে আমার জবরদস্তিতে। সেটাই বাড়িতে রীতিমতো কাহিনী হয়ে দাঁড়ালো। অবশ্য প্রথম গোলাটা ছুঁড়েছেন বড়-জা আড়াল থেকে। তারপর কানে কানে শ্বশুর-শাশুড়ী শুনলেন। তিল তাল হলো। ওর এমনিতেই সহ্যশক্তি অল্প, প্রথমে তবু মৃদু প্রতিবাদ করলো। কেউ গা করলো না। সেজ

ভাশুর আবার চিকন কাটতে শুরু করলেন; বললেন, ওতো আর বাপ-মার দেখে দেয়া বউ নয়, রীতিমতো ভালোবাসার বউ। আব্দার ঠেলবে কোন সাহসে?

প্রসাদ বারান্দায় বসেছিলো, হঠাৎ তুবড়ীর মতো ফেটে পড়লো। মেজ-জা বেরিয়ে এলো তক্ষুনি। বললেন, মারবে নাকি! যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। কেন, আমাদের শাড়ি পরতে সাধ যায় না।

বড়-জা বেরিয়ে এসে মেজকে বকলেন বটে, সঙ্গে সঙ্গে ওকে শুনিয়ে বললেন, যৌথ সংসারে অমনটি চলে না ঠাকুরপো।

ওর তখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। বললে, না চললে, চলবে না।

বড়-জা বললেন, তুমি তাহলে আলাদা হয়ে যাবে?

যদি তা ভাবো তাই।

ব্যস্ পড়ে গেলো বাড়িময় হুলস্থুল। এ বাড়িতে আমার শ্বশুর শাশুড়ীর উপস্থিতিতে এমনতরো ঘটনা এই প্রথম না হলেও এই-ই চরম। ওদিকে তখন অফিস পাল্টানোর ঝামেলা। নতুন অফিস হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে অনেক কিছুর দায় দায়িত্বের অনেকটাই ওর একলার ঘাড়ে,—তার উপর এ ঝামেলা। তিন দিন পরে সে আমাকে নিয়ে আলাদা হলো।

আর কেউ না জানুক আমি তো জানি আমার প্রতি ওর টান কি ধরণের। তাছাড়া সবচেয়ে ভয় হলো নিজের শরীর নিয়ে। কারণ ওর কাজের জগৎ শুধু ওর অফিসটা, তার বাইরের কিছুই সে জানে না; আর ওর ঘরের জগৎ আমার দেহটা, তাকে বাদ দিয়ে সে আর কিছুই ভাবতে পারে না। অথচ শরীরের যা অবস্থা বেশি টানাপোড়েন তখন কিছুতেই সইবে না। কিন্তু ওকে ঠেকাবে কে? তাছাড়া ঠেকানোর ফল যদি উল্টো হয়? যদি সে, তার মন বাইরে ছোটে? আতঙ্কে, ভয়ে, উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় আমি এতটুকু হয়ে গেলাম। অচিরে শরীর ভাঙতে শুরু করলো। তার উপর ঘর সামলানোর সাত-সতেরো দায় দায়িত্ব। তাকে ধরে রাখতে গিয়ে সে আমাকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিলো। সে এক রক্তাক্ত স্মৃতি। আমার জীবনের তিক্ততম অভিজ্ঞতা।

আমার আর মা হওয়া হলো না। মৃত্যুর মুখোমুখী হতে হতে সর্বস্ব খুইয়ে ফিরে এলাম। ইচ্ছে হলো অভিসম্পাত দিই নিজেকে, স্বামীকে এবং অকরুণ ঈশ্বরকে। পারলাম না। বাধলো। বলতে পারো কুসংস্কারাছন্ন বলে, মমতায় অন্ধ বলে, অথবা ভীরু বলে। হয়তো তাই। কিন্তু আমি তো স্পর্শ করেছি

আমার স্বামীর তখনকার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর ভয়কে। সংসার সম্পর্কে কত স্বল্প জ্ঞান তার। তবু তার নিপুণ সেবায় আমি স্নিগ্ধ, তার বিমল আন্তরিকতায় আমি ধন্য।

আমি দিনে দিনে আবার ঐশ্বর্যময়ী হলাম। এবং বলতে দ্বিধা নেই আমার স্বামীকে আমি গভীর ভাবে ভালো বাসলাম। শিখলাম কি করে তার দুঃখকে যন্ত্রণাকে আমার করে নিতে হয়। প্রীতি দিয়ে, মমতা দিয়ে, সহানুভূতি স্নেহ, শ্রদ্ধা সবের বিনিময়ে আমি তার অন্তরঙ্গ হবার ত্রুটি করিনি।

কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছে অন্য।

সেবারে আমরা সমুদ্রের ধারের এক শহরে মাসখানেকের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওর পুজোর ছুটি ছিলো, তা ছাড়া আরও কিছু ছুটি তার পাওনা ছিলো, সব মিলিয়ে মাসেরও কিছু বেশি। সেই ছুটির দিনগুলোকে শহরের অপরিসরে কাটাতে আমি অরাজী ছিলাম না, কিন্তু ওর ভীষণ দ্বিধা।

এই প্রথম আমি বাইরে বেরোলাম, যেখানে আমি আর আমার স্বামী ছাড়া সবাই অপরিচিত। আর এই প্রথম আমার মনে হলো, পৃথিবীটা কি বিরাট আর সুন্দর! ঘরের পরিসরে আমার মনে হতো পৃথিবী বুঝি এইটুকুই, তার বৈচিত্র্য নেই, সে একঘেয়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই সমুদ্রের ধারের শহর আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো তা নয়, তা নয়। আমি সদ্য সুপ্তোত্থিতের মতো চোখ মেললাম। আর যা দেখলাম রঙে, রসে তা অপূর্ব, তার তুলনা নেই।

এখানেই সৌমিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয়। ও প্রসাদের অনেকদিনের বন্ধু, দীর্ঘদিন যোগাযোগ ছিলো না ওদের, হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো এই শহরে। সেও ছুটিতে এসেছে। প্রসাদ আমার সঙ্গে সৌমিত্রর পরিচয় করিয়ে দিলো। প্রথম দিনই সে আমার লক্ষ্মী-শ্রীর প্রশংসা করলো। ওকে বললো, তুই সত্যিই ভাগ্যবান। হেসে হেসে জানালো, এরকম একটা বউ খুঁজে দে না, চটপট বিয়ে করে ফেলি।

আমি বললাম, বউ খুঁজে দেবে কি, বরং বলুন একটি কনে দেখতে।

সৌমিত্র চমকে মুখ তুললো। তারপর ভীষণ হাসতে হাসতে বললো, সত্যিই তো!

প্রসাদ বললো, দেখলি তো কি রকম বউ। একেবারে সদ্য খাপখোলা তলোয়ার।

ঝকমক করছে। না?

আমি ঘোমটাটা ভালো করে টেনে দিয়ে বললাম, তোমার মাথা।

আমি সরে এলাম।

এখন আর আমরা দুই নই, তিন। সৌমিত্র আমাদের সঙ্গী হয়ে গেলো, ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সেই সীমাহীন সমুদ্র, অনন্ত আকাশ, বিস্তীর্ণ বালুভূমির আর অগাধ অবাধ হাওয়ার হাতে আমরা তিনজন কি আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্যই না ঘুরে বেড়ালাম। দেখলাম, দিগন্ত উদ্ভাসিত করা সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত, বিন্যস্ত নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিসারিত আকাশ, ঢেউয়ে ঢেউয়ে উচ্ছল সমুদ্র আর সংখ্যাহীন জ্যোৎস্নার খুশিতে ফেটে পড়া অজস্র ফেনার রাশি।

সমুদ্র আমাকে অনেক দিলো। এক দুর্লভ মগ্নতা, প্রসাদের ভালোবাসা আর সৌমিত্রের বন্ধুত্ব।

কিন্তু শুভ, আগেই বলেছি কিছুই নিরবচ্ছিন্ন নয়। সেই সমুদ্র নয়, মগ্নতা নয়, ভালোবাসা নয়, এমন কি বন্ধুত্বও না। সমুদ্রকে ছেড়ে এলাম, মগ্নতা ভাঙলো; রূপান্তরিত প্রসাদের ভালোবাসা আবার যেই সেই হয়ে গেলো, আর সৌমিত্র দাবি করলো বন্ধুত্বের চাইতেও বেশি কিছু, যা শুধু মাত্র বন্ধুত্ব নয়।

শুভ, আমি নারী, রক্তে ও মাংসে। আমার কামনার সবটাই শুদ্ধ নয়। মাংসলতা তাতে প্রচুর। তাই ফিরিয়ে দিতে পারলাম না হঠাৎ পাওয়া এ পুলককে। আমি অভ্যস্থ পথ ছেড়ে গলি-ঘুঁজির আশ্রয় নিলাম। সৌমিত্র বাঁধা পড়লো।

শুভ, তুমি তো জানো আমার লেখাপড়া কতোটুকু। স্কুলের শেষ ধাপটাও পার হইনি, না তা নয়, পার হবার সময় পাইনি। তার আগে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা বলে আমি কি সত্যিই অশিক্ষিত? না হয় স্কুলের পড়া শেষ করিনি, কলেজের ডিগ্রী পাইনি, ইউনিভারসিটির ছায়া মাড়াই-নি। কিন্তু জীবনের কলেজে, ইউনিভারসিটিতে আমি তো ফাঁকি দিইনি। তাছাড়া কলেজের ডিগ্রীই কি শিক্ষিত হওয়ার একমাত্র মানদণ্ড? আমি তা মনে করি নে, করি না। অবশ্য সেই আঙুরের প্রতি আমার লোভ ছিলো, আজও মনে আমার কি দুঃসহ দুঃখ, যদি সে আঙুর আমার নাগালে আসতো! যদি

আসতো, শুভ আমাকে বোঝাতে হতো না, তোমরা নির্বিবাদে স্বীকার করতে, সবাই করতো। এদেশের যে এই-ই ধারা। আমি তা থেকে বঞ্চিত, ফলে শাদা কথায় আমি অশিক্ষিতা। তাই সই শুভ, তাই সই। কিন্তু গোপনে তোমাকে জানিয়ে রাখি, নির্দিষ্ট কোনো পাঠক্রম আমি মানিনি সত্য, কিন্তু অনির্দিষ্ট অনেক পাঠ আমি গ্রহণ করেছি, অবকাশের মুহূর্ত কাটাবার জন্যে এবং ঈর্ষায়। তুমি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবছো. ঈর্ষা কেন? কাকে? ও ঈশ্বর! সে আমার এক বিদুষী প্রতিবেশিনী, যাঁর তেজ আমাকে দগ্ধ করতো, যাঁর অহঙ্কার আমাকে লজ্জা দিতো। কিন্তু আশ্চর্য কি জানো, সেই বিদগ্ধা মহিলা এখন সত্যিই সংসারানলে দগ্ধা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁকে বাঁচাতে পারেনি। আজ সেই বিদগ্ধ মহিলার ব্যবহারের সঙ্গে সাধারণ দশটি গৃহিণীর কোনো তফাৎ নেই। একেবারে একাকার! তার মানে এই নয় যে আমি তাঁকে ছাড়িয়েছি, আসলে আমি তাঁকে ছুঁতে চেয়েছিলাম। ডিঙোতে চেয়েছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য, আমি তার কিছুই পারিনি। তিনি আমাকে এড়িয়ে গেছেন।

শুভ, আমি কিছুই প্রমাণ করতে বসিনি। প্রয়োজনই বা কি। আমি যা, আমি তাই-ই। এবং তোমার মন্তব্যে সন্দেহ করার কিছুই নেই, কারণ তুমি ঠিকই বলেছো, 'এ শহরে দেখে দেখে শুনে শুনে অনেক দূর যাওয়া যায়'। আমিও তাই এসেছি। তবে একটা কথা বলে রাখি, তোমার সম্পর্কে তুমি একটু বাড়াবাড়ি করেছো। এত বিনয় তোমার চরিত্রে অশোভন। আমি জানি বলেই বলছি, তুমি নিজেকে ঠাট্টা করেছো, রাগের মুহূর্তে সুতীব্র ব্যঙ্গ।
কোথা থেকে কোথায় চলে এলাম। কি এসে যায় আমি শিক্ষিতা না অশিক্ষিতায়? সব চেয়ে বড়ো কথা আমি কি চাই, কি চেয়েছিলাম? বিশ্বাস করো শুভ, ঠিক ঠিক আমিও জানি না, জানি নে। তবে এ জানতাম, আমি যা পেয়েছিলাম, সে সব ছাড়াও আরও কিছু। আরো অনেক কিছু আমি চাই, চেয়েছি। পেয়েছি কি না, সে প্রশ্ন পরবর্তী। সে প্রশ্নের জবাব এ মুহূর্তে আমি দিতে পারি নে, কারণ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি এখানেই জীবনের শেষ, এ আমি মানি নে। আমি জানি, আরও দূর যেতে হয়, যেতে হবে।

বরং সৌমিত্রের কথা বলি। সৌমিত্র আমাকে ভালোবাসলো। আর সে কি ভালোবাসা? সে যেন আমার হাতের পুতুল, যেমনটি নাচাই তেমনটি নাচে।

একেবারে শিশুর মতো অবোধ, আর অন্ধের মতো অসহায়। কিছুদিন কী তীব্র উত্তেজনায় আমি তাকে শাসন করেছি, আঘাত করেছি, কাছে টেনেছি, দূরে ছুঁড়েছি। সে কী আশ্চর্য খেলায় আমি মেতে উঠেছিলাম ঈশ্বর জানেন। সে আমাকে প্রলুব্ধ করতো অনেক দূরের কোনো এক অপরিচিত স্বর্গে পালিয়ে যেতে, মনের মতো ঘর বাঁধতে। তখন আমার গর্ভে প্রসাদের দ্বিতীয় সন্তান। কিন্তু সে খবর সৌমিত্র জানে না। যখন জানলো তখন, কি করে জানি নে, সেই কাপুরুষটা হঠাৎ ক্ষাত্র তেজে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলো, এবং সেই প্রথম ও শেষবার সে আমাকে প্রথমে কিল-চড়-ঘুষি, এবং যখন উত্তেজনা একটু কমলো, তখন অজস্র চুম্বন আর চোখের জলে ভিজিয়ে দিলে। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বুঝলাম এখানেই শেষ নয়। সে যখন একেবারে শান্ত হলো, তখন তাকে মনে হলো চরম বর্ষণের শেষের মেঘের মতো কালো আর থমথমে। সে কী গাম্ভীর্য। তারপর সে একটি একটি করে অনর্গল অনেক কথা বললো, যার সোজা অর্থ হলো, এখানেই ইতি।

ঈশ্বর জানেন, সেদিন কি আশ্চর্য স্বস্তি নিয়ে ঘরে ফিরেছি। মনে হয়েছিলো মুক্তি, মুক্তি। আমি মুক্ত।

আবার সেই ঘর, ঘরের পরিসর। আর আমি এই ঘরের নির্দিষ্ট ঘরণী। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। আমি অনুতপ্ত হলাম এমনতরো খেলায় মেতে ওঠার জন্যে, লজ্জিত হলাম মনে মনে। কাঁদলাম। তারপরে আবার অনুশোচনা হলো সৌমিত্রকে চিরদিনের মতো হারানোর জন্যে। মনে হলো আমি আবার নিঃসঙ্গ হলাম, আবার সেই একঘেয়ে জীবন। সেই দুঃখ, যন্ত্রণা, দাহ। ইচ্ছে হলো সৌমিত্রের কাছে ফিরে যাই, বলি, আমি তোমার, শুধুই তোমার—কিন্তু সে শুধু ইচ্ছেই। সে অসম্ভব। প্রসাদের সন্তান যে আমার গর্ভে। তা নয়, আমি কিছুতেই বলতে পারতাম না, আমি প্রসাদের নই, সৌমিত্রের।

মনকে প্রশ্ন করলাম, সৌমিত্র তোমার কে? না, সে কেউ নয়, শুধু অবকাশের সঙ্গী, বন্ধু। ব্যস্‌ ওইটুকুই। সে আমার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়নি, তার উপর আমি নির্ভর করতে পারি নে। কি বিশ্বাস তার আবেগের মুহূর্তের কথা দেওয়া অথবা না-দেওয়ায়? আমি নিজেকে ফিরে পাবার চেষ্টায় মন দিলাম।

শুভ, তুমি কি কখনও ঘুড়ি উড়িয়েছো? যদি উড়িয়ে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই জানো, প্রতিপক্ষের আক্রমণের ভয় যদি না থাকে তাহলে নির্দ্বিধায় সুতো ছেড়ে

যাওয়ার কি মজা! যতোই উপরে ওঠে ততোই মজা, ততোই আরাম। ইচ্ছে হয় না আরও ছাড়ি, আরও আরও! তখন গুটোনোর নামে ভয়, সে যে প্রচুর পরিশ্রম। শখের উড়িয়ের পক্ষে সে যেন বাড়তি মাশুল।

আমারও তাই হলো। নিজেকে ফিরে পাবার পরিশ্রম ভীষণ দুরূহ মনে হলো, নিদারুণ কঠিন। কিন্তু উপায় নেই, যেহেতু মা হবার সময় আসন্ন। নিজেকে সাধ্যমত গুটিয়ে নিলাম। মনে সাহস এলো। আমি প্রচণ্ড বিশ্বাসে মা হলাম। সে এক অনির্বচনীয় সুখ, সে এক অতুলনীয় যন্ত্রণা।

যে অসহনীয় অবকাশ আমার দুঃখের কারণ, সে অবকাশ হঠাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেলো। আমি অন্তহীন কাজের গভীরে ডুবে গেলাম। শুধু সকাল সন্ধ্যে নয়, মাঝ-রাত্তিরেও কাজের কমতি নেই। কাজ আর কাজ। ঘরের কাজ, ছেলের কাজ, স্বামীর কাজ—সে অন্তহীন। এই অপরিমিত কাজ আমাকে ঘরের পরিসরে বাঁধলো। আমি বাঁধা পড়লাম। মনে হলো আমাদের শিকড় ক্রমশ গভীর থেকে গভীরে যাচ্ছে, চারা ক্রমে বনস্পতি হতে চলেছে তার দীঘল শাখা আর নিবিড় পল্লবের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে। অবশ্য এর আগেও কাজ ছিলো না তা নয়, কিন্তু সে কাজ মাত্র দুজনের। একটি সংখ্যার বৃদ্ধি অঙ্কের হিশেবে নিশ্চয় একের বেশি নয়, কিন্তু সংসারের হিশেবে এই একই অনেক। এ তুমি এখন বুঝবে না। এবং আরও আশ্চর্য কি জানো, যে ঘরটাকে এতদিন বিরক্তিকর বিশ্রামাগার বলে মনে হতো, সে ঘরটাকে মনে হলো অফুরন্ত শান্তির স্বস্তির এক আশ্চর্য আবাস। এখানে প্রচুর আলো, অগাধ হাওয়া। এখানের আকাশ অনেকটুকু। এখানে রাত্রে চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, চোখের উপর দিয়ে মেঘ উড়ে যায়, পাখি ছুটে যায়, সে অনেক কিছু। জানো শুভ— একই দিন-রাত্রি এখানেও আসে। অথচ এ কথা জানতে আমার অনেক অনেক দিন লাগলো।

তাছাড়া এ ঘরে অনেকে এসেছে। তুমি এসেছো, পল্লব এসেছে। এই ঘরেই আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মনুর মার, শেফালিদির, নতুন কাকার, বনমালী বাবুর। এ ঘরে বসেই আমি দেখেছি ও-বাড়ির লিলিকে, লিলিদের পাশের বাড়ির ডাক্তারী পড়ুয়া ছাত্র অতীনকে। দেখেছি চিনু, চিনুর বাবা-কাকাদের ওর মা-খুড়িকেও। তাও বা কেন, মঞ্জুলা, টুলু, শান্তা, শিবু, সরিৎ, নারান, ট্যাবলা, সবাইকে কি এ-ঘর থেকেই দেখিনি?

শুভ, কতো বিচিত্র আমাদের এ গলির মানুষগুলো। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই, কোথাও না। তবুও এরা কেউই ভয়ংকর নয়। ছিদামবাবু না, ভোলা দরজি না, কানুদাস না, নাড়ুবাবুও নয়। ওই যে জাঁদরেল বাড়িওয়ালা বড়োলোক আশুবাবু, তিনিও না।

আসল কথা দেখা। তুমি কি ভাবে দেখছো তার ওপরে মানুষগুলোর রকম ফের হবে, নইলে শাদা চোখে দেখে--সব মানুষ মানুষই, তার দোষে-গুণে, কলঙ্কে-কলঙ্কহীনতায়। এবং শুভ, বিচার করার সময় খণ্ডকে কেন্দ্র করলে চলে না, তাতে বিচার সম্পূর্ণ হয় না। ধরা যাক, একটি মানুষের দেহ। আমি যদি একটি হাত এনে দিই তোমাকে, তুমি সম্পূর্ণ দেহের বিচার কি করে করবে? আমরা ভুল করি সেখানেই। কোনো একটি ঘটনা দিয়ে তুমি কোনো একটি মানুষ সম্পর্কে শেষ মন্তব্য করতে পারো না। কিছুতেই না। তা ছাড়া যে সব কলঙ্কের কথা তুমি তোমার বন্ধুকে লিখেছো, আমি ঠিক তেমনি অজস্র মানুষের ভালোমানুষীর কথা তোমাকে লিখতে পারি যা কোনোদিন তোমার নজরে পড়েনি, নয় তুমি এড়িয়ে গেছো।

ধরা যাক, সেই অন্ধ কুষ্ঠ রোগীর ঘটনাটা, যে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে রাস্তা পার করে দেবার জন্যে বার বার মিনতি করে বলছিলো, বাবুজী, রাস্তাটো পার কর দিজিয়ে না?

সত্যি কথা, তোমাদের মতো অনেকেই পাশ কাটিয়ে চলে গেছে, সেই অন্ধ কুষ্ঠ রোগীর বহুত মিনতি তাদের স্পর্শ করতে পারেনি, অথবা স্পর্শ করলেও বেধেছে। আত্মরক্ষায় উদগ্রীব তোমরা কিছুতেই তা পারতে না আমি জানি, আমিও পারতাম না। তা বলে সেই অন্ধ কুষ্ঠ রোগী কি সেখানে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে মিনতি করেছিলো? না শুভ, তা করেনি, তাকে পার করে দিয়েছে, তার কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হাত ধরেই। এবং যে পার করে দিয়েছে সে তোমাদেরই বয়সী, অবশ্য তোমাদের মতো অত পরিচ্ছন্ন পোশাকের অধিকারী নয়। তার মধ্যে কি আত্মরক্ষার প্রবণতা ছিলো না? নাকি সে আত্মহত্যা-প্রবণ কেউ? শুভ, মুখ চোখ যদি মানুষের মনের দর্পণ হয় তাহলে বলতে পারি সে লোকটা ভীষণ সুস্থ, এবং তার মনে দ্বিধার লেশ মাত্র ছিলো না, অথবা কোনো একটা অভাবিত কাজ করার অহংকার। সে লোকটা বিরল সহজতায়, স্বাচ্ছন্দ্যে সে-কাজ করেছে, আমি দেখেছি।

হয়তো আমার দেখার ভুল, হয়তো এমনি অনেক কিছু, যুক্তি দিয়ে তোমরা তা

প্রমাণ করতে পারো মানি, কিন্তু আশু মিত্তিরের ঘটনাটা ? যে চূড়ান্ত মাতাল হয়ে ফিরছিলো, যে ঠিক মতো পা ফেলতে পারছিলো না বলে দেয়াল ধরে ধরে পথ চলছিলো, সেই আশু মিত্তির সেদিন রাত্রে—তখন রাত কতো,—এগারোর বেশি নিশ্চয়ই, পাড়া একরকম নিঝুম বলতে পারো, এসে দাঁড়ালো সতীশ মুদীর দোকানের সামনে। সতীশ তখন শেষ ঝাঁপ ফেলে দোকানে তালা দেবে, আশু মিত্তির জড়ানো গলায় বললে, এ্যাই, এক প্যাকেট সিগারেট দে। সতীশ মুদী একবার পেছনে তাকিয়ে দোকানে ঢুকে সিগারেট দিতেই, আশু মিত্তির একটা নোট এগিয়ে দিলো। খুচরো ফেরত দেবার পর আশু মিত্তির চলে গেলো সেই দেয়াল ধরে ধরে নিজের ঘরের দিকে। সতীশ ঝাঁপ ফেলে রাস্তায় নামতেই চোখে পড়লো কতকগুলো কাগজ। ঠিকই আন্দাজ করলো, কাগজ-গুলো আশুবাবুরই। কুড়িয়ে নিতে গিয়েই চোখ বড় হয়ে গেলো সতীশের। দুমড়ানো একটা একশ' টাকার নোটও আছে সেই কাগজের মধ্যে।

সতীশ কি করেছিলো শুভ ? ভেবে দেখো, তখন কোনো সাক্ষী ছিলো না, কেউ না। তাছাড়া একশ' টাকা সতীশের এক মাসের কি তারও বেশি সময়ের রোজগার। তবু সতীশ টাকাটা ফেরত দিয়েছিলো।

না, সবচেয়ে ভালো হয় যদি বিশের ঘটনাটা বলি। বিশে এ অঞ্চলের সব চাইতে নামকরা। ওর নামেই লোকে ভয় পায়। কেন পায় সে অনেক কথা। অথচ পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা টিঙ্‌টিঙে হাড়সর্বস্ব তিরিশ বছরের বিশেকে হঠাৎ কেউ দেখলে গ্রাহ্যই করবে না, অথচ থানার বড় সাহেব পর্যন্ত ওকে সমীহ করে। বলে ওরে বাবা, ও তো তালব্য শ বিশে নয়, মূর্ধন্য ষ বিষে! একেবারে ঝাঁঝরা করে ছাড়লো।

এই বিশের কতো ইতিহাস। ওর নামে কতো কাহিনী। তার মদ খাওয়ার রেকর্ড আছে, মারামারিরও। অথচ এই বিশেই যখন শুনলো, তেতুলতলার ভানু গোপের বউ তিনদিন মর্গে মরে পড়ে আছে, দাহ করার সামর্থ্য ভানু গোপের নেই, সাহায্য করার লোকও না, অথচ পাঁচ-পাঁচটি ছেলে ঘরে, তাদের না দিতে পারছে ভাত, না কাপড় ; তখন বিশে নাকি উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছিলো, আর গাল দিচ্ছিলো বিশ্ব-সংসারের সমস্ত মানুষকে। ভানু গোপকে বলেছিলো, আপনি মশাই একটি আস্ত জানোয়ার। একেবারে আস্ত। নইলে তিন দিন একটা বউ মরে পড়ে থাকে ?—বলতে বলতেই সে গলার মাফলার কোমরে বাঁধলো। ভানু গোপকে বললো, আপনি বসুন এখানে, এই এলাম

বলে। বিশে বেরিয়ে গেলো। রাস্তায় যাকেই দেখলো তার কাছেই সে হাত পেতে দাঁড়ালো। দু আনা চার আনা করে দশটাকার উপর সে তুলে ফেললো। তারপর ছুটলো কাউন্সিলরের কাছে, কিন্তু বিশের দুর্ভাগ্য উনি তখন বাইরে। কি করবে বিশে, অথচ কাউন্সিলরের সইয়ের দরকার নইলে বিনিপয়সায় মরা পোড়ানো চলবে না। সে গেলো অধর মুন্সীর কাছে যে সই জাল করতে ওস্তাদ। ব্যাস্ কাজ হয়ে গেলো। বিশে দল বল নিয়ে ছুটলো। আর পথেই ভানু গোপকে দশটা টাকা দিয়ে বললো, যান মশাই, কিনে নিন যা প্রাণে চায়, শাড়ি, ফুল, চন্দন যা খুশি।

যখন মর্গে পেঁছিলো তখন ভর দুপুর। মর্গে ঢুকতে গিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে এলো বিশে। উঃ কি দুর্গন্ধ! একেবারে পচে গেছে হয়তো। সাগরেদদের বললো, তোরা বাইরে দাঁড়া, বলেই ঢুকলো ভেতরে। তারপর পাঁজা কোলা করে মড়াটাকে এনে শুইয়ে দিলো খাটিয়ায়। বললো, বলো হরি, হরি বোল। সবাই সমস্বরে বলে উঠলো। ভানু গোপকে বললো, নিন, এবার সাজান মশাই, সাজান। ভানু তখন কাঁদছে। হয়তো নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে, ছেলে-পুলের কথা মনে করে, অথবা দশ বছরের সঙ্গিনীকে চিরদিনের মতো হারানোর জন্যে।

বিশে বললো, কান্না থামিয়ে সাজান দেখি, বেশ করে সাজিয়ে দিন। এই তো শেষ সাজানো মশাই, আর তো সাজাবেন না। সাজান সাজান. একেবারে মনের মতো করে সাজিয়ে দিন। বিশে উল্টো দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সাগরেদদের ফিস্ ফিস্ করে বললো, সরে আয়, ও সাজাক। তারপর যেন মনে মনেই বললে, কাকে সাজাতে বলছি রে? ধেৎ তেরি!—সে পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরালো।

বিশের এ কাহিনী অনেকেই জানে।

এমনি অজস্র ঘটনা তোমাকে বলতে পারি, অজস্র মানুষের দৃষ্টান্ত। অবশ্য এদের সবটাই যে ভালো, তা নয়। এই সতীশকেই ধরো না কেন? ওর দোকানের বাটখারাগুলো ওর ঠাকুর্দার আমলের। ও নতুন বাটখারায় মাল বেচে না, যদিও সতীশের দোকানের মালের দাম অন্য দশ দোকানের চাইতে একটু কম। শুভ, মানুষ মানুষই। তবে তর-তম আছে, থাকবেই। আচ্ছা, জ্যোৎস্না রাতে কখনও গ্রামের রাস্তায় হেঁটেছো, যেখানে পথের দুপাশে অজস্র গাছ-গাছড়া, পাতা-লতা, ঝোপ-ঝাড়। যদি হেঁটে থাকো নিশ্চয়ই একটিবার হলেও

চমকে উঠেছো ভয়ে। মনে হয়েছে, একটি শাদা কাপড় পরা লোক বুঝি দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। সাহস করে এগিয়ে যেতেই দেখেছো ও কিছু না, জ্যোৎস্নার কীর্তি। আসলে যাদের ভয় করি, যাদের মনে হয় পশুর পর্যায়ের, নির্ভয়ে এগোও, দেখবে আসলে সবটাই ছায়া। রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়া মানুষের স্বভাব ; সে দোষ রজ্জুর নয়, স্বভাবের। আর যে ঘটনাগুলোকে আমরা স্খলন-পতনের নজীর হিশেবে মুখে মুখে স্মরণীয় করে তুলি, আসলে ঘটনাগুলো নিজেদের জীবনের নয় বলেই। যদি নিজেদের হতো তা হলে বিচার করতাম কার্য-কারণের সম্পর্ক দিয়ে, হয়তো অনুতপ্ত হয়ে মুক্তি পেতাম, নয়তো ক্ষমা করতাম, কারণ যুক্তি-বুদ্ধি দিয়েই প্রমাণ হতো যে, আসলে সে-স্খলন ইচ্ছাকৃত নয়, বাধ্যতামূলক ; পরিবেশ পারিপার্শ্বিকের চাপে। তাছাড়া সে-সব স্খলন-পতন কি মানুষের স্বভাবের বাইরের ? না কি অভাবিত ? তা যখন নয় তখন সে সব নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন ? এত হৈ চৈ ?

ধরো, লিলির কথা।

হতভাগিনী শেষ পর্যন্ত রেলের চাকার নিচে গলা দিয়ে মরলো। না মরে উপায় ছিলো কি। অথচ লিলির বাবা, সমাজে যিনি মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সবাই জানে তার আয়ের পথ খুব সোজা নয়, শোভনও নয়। তবু কি আশ্চর্য তিনি মানিয়ে গেছেন এ শহরের অজস্র কোলাহলে, কিন্তু লিলি মরে বাঁচলো। সেই উঁচু-মাথা বাপটা কি অকাজই না করে বেড়াচ্ছেন প্রতিদিন, অথচ লিলিকে উনিই মাঝ রাত্তিরে ঘরের বাইরে বের করে দিলেন, এক গলি লোকের সামনে। কিন্তু কি এমন করেছিলো লিলি ? সে ভালোবেসেছিলো, বিশ্বাস করেছিলো, এই তো। ভালোবাসা, বিশ্বাস যদি কারও গায়ে কালি ছিটোয়, কাউকে কলঙ্কিত করে, সে দায় কি শুধু যে ভালোবাসলো, বিশ্বাস করলো, তার ?

অবশ্য লিলিই আমাকে বলেছে, অতীনের কোনো দোষ নেই। সে বার বার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, লিলিই রাজী হয়নি। কেন হয়নি ? বড্ড জটিল মনস্তত্ব, শুভ। সর্বনাশ আসন্ন জেনেও কি করে লিলি রাজী হল না, আমি ঠিক বুঝি নে। তবু লিলির কাছ থেকে যেটুকু শুনেছি, লিখছি।

একদিন ওরা নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলো। তোমার জানা আছে, সেখানে নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়। এমনি নৌকোয় ওরা অনেকদিন বেড়িয়েছে। সেদিনও বেড়াতে গিয়েছিলো, তখন বেলা পড়ো পড়ো। মাঝ নদীতেই সন্ধ্যা

হলো। ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ছইয়ের ওপর, গলুয়ের ওপর। ছইয়ের তলায় আগেই ছায়া ছিলো, তখন নিবিড় অন্ধকার। মাঝি দুজনে হয়তো ইচ্ছে করেই হারিকেনের চিমনিটা না মুছেই ফিতেয় আলো জ্বাললো। সে আলো, ঠিক আলো নয়, আলোর ছায়া। এবং সে হারিকেনটাও এক সময়ে মাথার দিকে নিয়ে গেলো বয়ার সাথে দড়ি বাঁধার অছিলায়। দড়ি বাঁধা শেষ হতেই মাঝি দুজন হালে গিয়ে বসলো, বিড়ি ধরিয়ে গান ধরলো, দরিয়ার গান। যে দরিয়ায় একবার ডুবলে কলঙ্কে আর ধরে না। এবং সে কলঙ্কে মুখ পোড়ে, মরে।

লিলিও মরলো।

অতীন কিন্তু লিলিকে বিয়ের কথা বলেছিলো, লিলি মত দেয়নি। কারণ কি? না, লিলিই নদীতে বেড়াবার কথা অতীনকে প্রথমে বলেছিলো, আর সে বেড়ানোই অতীনের মতে সর্বনাশের কারণ। অবশ্য একথাগুলো অতীন স্বাভাবিক অবস্থায় বলেনি, একদিন কথায় কথায় রেগে লিলিকে বলেছিলো। সেই হঠাৎ রাগের মাথায় বলা কথাকে লিলি বড্ড চড়া দাম দিলো। তার ধারণা অতীন ওকে যথার্থ ভালোবাসে না। একটা অঘটন ঘটে গেছে, এবং তখন দ্বিতীয় কোনো পথ নেই বলেই অতীন লিলিকে বিয়ে করতে বলেছে। বিয়ের পরে, লিলির ধারণা—অতীন ওকে নানা ভাবে যন্ত্রণা দেবে। তার চাইতে এ কলংক ঢের ভালো। প্রয়োজন হলে সে মরবে, তবু অতীনের গলগ্রহ হবে না। তাছাড়া লিলি জানে, অতীনের মা-বাবা লিলিকে কিছুতেই মেনে নেবেন না, শুধু তাই নয়, অতীনের লেখাপড়ার খরচ দেয়া বন্ধ করবেন। অথচ ডাক্তারী পাশ করে না বেরোনো পর্যন্ত অতীনের বাজার দাম কতটুকু? সে সংসার চালাবে কি করে?

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, একজন ডাক্তারী পড়ুয়া ছাত্র হয়ে ও এরকম বোকামি করলো কেন?

লিলি স্বীকার করেছে, এবং নিদ্বির্ধায় বলেছে যে, লিলিই প্রতারণা করেছে ওর সাথে--কারণ লিলি অতীনকে বাঁধতে চেয়েছিলো চিরদিনের মতো। পরে সে সব দিক বিচার করে দেখলো যে, সে অসম্ভব। তাতে অতীনের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। যেহেতু লিলি অতীনকে ভীষণ ভালোবাসে, সেহেতু সে সমস্ত ক্ষতির ভার একাই বহন করবে, অতীনকে বিরক্ত করবে না।

লিলি জীবনের মূল্যে সে-ক্ষতি বহন করেছে। না করে উপায় ছিলো না। তার উঁচু মাথা বাপটা বারবার লিলিকে জিজ্ঞেস করেছে, কে সে? লিলি

কোনো জবাব দেয়নি। অতঃপর বাক্স-প্যাটরা ঘেটে উদ্ধার হলো অতীনের নাম। ব্যস্, ওই লোকটাকে আর পায় কে? সেই চিঠিপত্র সম্বল করে লিলির অজ্ঞাতে দিলে মামলা করে। লিলি তখন মরিয়া। যে দ্বিধা এতদিন ওকে ঘরে ধরে রেখেছিলো, সে সে-দ্বিধা কাটিয়ে উঠলো। তখন লিলির সে কী রূপ! সে মামলা ঠেকাবেই। কিন্তু তা হলো না। লিলির বাবা লিলিকে ঘর থেকে বের করে দিলো।

পারতো, শুভ, লিলি বাঁচতে পারতো। কিন্তু ওর কোথায় যেন একটা জটিলতা ছিলো, লিলি সে জটিলতাকে এড়াতে পারেনি, সে মরে বেঁচেছে। অথচ এ লিলিকে নিয়ে কতো কেচ্ছা, কতো কোলাহল, কতো কাহিনী। সে মরে গেছে, তবু তার কাহিনী অতিরঞ্জিত হয়ে মুখে মুখে ঘুরছে। লিলির জীবনে এতো কি ছিল শুভ, যা নিয়ে গবেষণা, হৈ চৈ আর রসিকতার অন্ত নেই? অথচ ভালোবাসা-বাসির ঘটনা কি এ-সংসারে আকছার ঘটছে না? এ সমাজ কি তাকে মেনে মানিয়ে নিচ্ছে না? তা ছাড়া এমনতরো সর্বনাশ শুধু কি লিলির জীবনেই ঘটেছে, আর কারও জীবনে ঘটেনি? তাহলে অনাথ আশ্রমে, রিফিউজে এত ছেলেমেয়ের ভিড় বাড়ছে কোত্থেকে? আড়ালে সর্বস্ব গেলেও, সামনে দিয়ে সূচটা সরাতে দেবে না, এই তো আমাদের সমাজ, শুভ!

অথচ এ সব তো মানুষের স্বভাবের বাইরের কিছু নয়। তাছাড়া হতে পারি আমরা মনু-পরাশরের বংশধর, কিন্তু লিলিরা তো ব্রহ্মচারিণী নয়; অতীনরাও সংযমী হিশেবে ডিপ্লোমা পায়নি। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। যে সংসারে, সমাজে যৌবনের অফুরন্ত শক্তির অপব্যয় রোধ সম্ভব হয় না, সে সমাজ রসাতলে যায়।

শুভ, আমি বড্ড বকছি, না? জানি, এ তুমি একটি কথায় বন্ধ করে দিতে পারো। বলতে পারো, তুমি তো সব পেয়েছো, যৌবন আসার আগেই যৌবন-ধর্ম চর্চার অপরিমিত অধিকার, তবু কেন?

বলছি শুভ, ধীরে ধীরে বলছি। অবশ্য আগে যে কিছু বলিনি তা নয়, তবু আরও স্পষ্ট করে বলবো, কিন্তু সময় লাগবে।

মেয়েদের বড়ো হতে খুব বেশি সময় লাগে না। বুড়িয়ে যেতেও না। ইতি-মধ্যেই আমি দুই ছেলের মা হয়েছি? বয়স কতো হলো? এমন কি? আমার বয়সী কি বছর খানেকের ছোটো হবে, ও বাড়ীর মঞ্জুলা সেদিনও তো ফ্রক

পরেছে। এখনও গুছিয়ে শাড়ি পরতে শেখেনি। কতদিন আমাকে বলেছে, মিনুদি, তোমার মতো কাপড় পরাটা একটু শিখিয়ে দাও না।

এই যা, আবার সেই মিনু। দেখো, সত্য বোধহয় চাপা দেয়া যায় না। নইলে যে নামটাকে তুমি করুণা করে আড়ালে ঠেলে দিয়েছিলে, সেটাই সামনে এগিয়ে এলো কেন? এই-ই হয়, না শুভ? তুমি মৃন্ময়ীকে পছন্দ করতে না, মিনুকেও নয়, ও-নামে সবাই আমাকে ডাকতো কি না? তুমি আমাকে ঋতু বলে ডাকতে। আচ্ছা, তুমি আমাকে ঋতু নাম দিয়েছিলে কেন? আমার ভালবাসার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ ছিলো, না! নাকি আমাকেই সন্দেহ করতে? তুমি বুদ্ধিমান। বলতে দ্বিধা নেই এর জন্যেই তোমাকে আমার ভালো লাগতো। কিন্তু তোমার দেয়া নামটা ঘরে চালানো যায় না। চালাতে পারিনি। ঋতু নামটা যথেষ্ট ঘরোয়া নয় কি না! তাছাড়া তোমার দেয়া নাম, তোমার মুখেই ভালো শোনায়, অন্যের মুখে ঠিক মানায় না।

দেখো শুভ, এই নামের মধ্যেই আমি আর এক নই, আমি তিন। না, ঠিক তিন নই, তিনের কিছু বেশি। কারণ প্রসাদ ভীষণ ভালোলাগার মুহূর্তে আমাকে 'ময়ী' বলে ডাকতো।

না শুভ, আমি তিনের কিছু বেশি নই, আমি পুরো চার। এবং ঈশ্বর জানেন, এ চার হুবহু এক নয়। পার্থক্য এদের অনেক। মৃন্ময়ীকে যারা চেনে তারা কদাচিৎ মিনুকে দেখেছে, আর মিনুকে যারা দেখছে তাদের কেউই ময়ীকে দেখেনি, এক প্রসাদ ছাড়া। শুভ, এ চারের চার ধরণের ইচ্ছা। আর সে ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে আমি ছিটকে পড়েছি। তুমি ঠিকই বলেছো, আমার স্বভাবের বিষ আমাকে উন্মত্ত করেছে। কিন্তু শুভ, আমি তো শুধু চার নই, আমি যে অনেক, অনেক। যে ছেলে-আগলে ঘরে বসে থাকতো, যে সৌমিত্রের সঙ্গে মিশতো, সুবল কল্যাণ শংকর পল্লবের সান্নিধ্যে খুশি হতো, যে রান্না করতো, ঘর মুছতো, প্রতিবেশিনীর সঙ্গে গল্প জমাতো, যে স্বামীকে ভালোবাসতো, শ্বশুরের অসুখে উপস্থিত থাকতো, এরা সবাই কি এক? তোমার কথাই ধরো না শুভ, যে আমার সঙ্গে মিশতো সে কি প্রীতির সঙ্গে মেশে, অথবা……? তাও বা কেন, তোমার তো অসংখ্য বন্ধু, প্রত্যেকের সঙ্গে কি এক শুভ কথাই বলে?

না শুভ, আমরা এক নই, অনেক। যে-ঋতুকে তুমি ভালোবাসতে, এবং যে-ঋতু এখন তোমাকে চিঠি লিখছে—দোহাই তোমার, মিথ্যে বলো না, এদের কি তুমি

মেলাতে পারছো ? আমি জানি, কেউই মেলাতে পারে না, তুমিও পারবে না। তা হলে ? আ ঈশ্বর ! আমার যদি কৃষ্ণের মতো অষ্টোত্তরশত নাম থাকতো, হলপ করে বলছি শুভ, আমি তোমাকে জনে জনে চিনিয়ে দিতে পারতাম, এত কথা বলতে হতো না। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতাম, কে ব্রজের রাখাল, কে ননীচোর, কে কালোসোনা, কে মদনমোহন, কে দূর্বাদল-শ্যাম, কে গোপীকান্ত, আর কেই বা শ্রীমধুসূদন ? অথচ আমার চারটি মাত্র নাম। সবাই যদি তোমার মতো নতুন নতুন নামে ডাকতো, আমি এক মৃন্ময়ীই অজস্র হয়ে যেতাম, চিনতে কষ্ট হতো না।

ও সব থাক শুভ। মিনুর কথা বলছিলাম তাইই বলি। পাড়ার ছোটোরা আমাকে মিনুদি, মিনুবৌদি, মিনুকাকী, মিনুপিসি, মিনুমাসি অনেক নামেই ডাকে। বড়োরা সরাসরি মিনু বলে। মঞ্জুলা এসেছিলো মিনুদির কাছে কাপড়পরা শিখতে। আমি শিখিয়েছিলাম। এই কাপড়পরা শেখাতে গিয়ে আমি নিজের দৈন্য, দারিদ্র সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলাম শুভ। কি নিখুঁত শরীর মঞ্জুলার, তাকিয়ে থাকার মতো।

মঞ্জুলাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোর বয়স কতরে মঞ্জুলা। মঞ্জুলা মিটি মিটি হেসেছিলো।

কিরে বলবি না ?

মঞ্জুলা তেমনি হেসে হেসেই বললো, মা বলেছেন পনের।

মা বলেছেন, আমি মুখ ভেঙচে বললাম, একেবারে খুকি, ন্যাকামো হচ্ছে ?

তাহলে কত ? মঞ্জুলা তেমনি হেসেই জিজ্ঞাসা করলো ?

আমি কি খড়ি গুণতে জানি ? তুইই বল না।

কাউকে বলবে না তো ?

বয়ে গেছে আমার।

মঞ্জুলা কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বললো, সতেরো পেরিয়ে সবে আঠারোয় পা দিয়েছি।

বলিস্ কি ? তুই আমার বয়সী ? আমি একটু অবাক হবার ভান করলাম।

মঞ্জুলা বললো, তবু দেখো না, মা বিয়ের কথাই বলে না। বলেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। বললে কোলে ছেলেপুলে না এলে মেয়েমানুষকে মানায় ? আবার তেমনি হাসি।

ও ঠাট্টা হচ্ছে, আচ্ছা, আজই মাসিমাকে বলবো।

পায়ে পড়ি মিনুদি, দোহাই তোমার। মঞ্জুলা মিনতি করতে শুরু করলো।

বললাম, ও এমনি বলছি। এসব কথা কি আর কাউকে বলা যায়?

না বাবা তোমাদের বিশ্বাস নেই। তোমরা সব পারো।

মঞ্জুলাকে আশ্বাস দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, চেহারাটা বেশ রেখেছিস: কিন্তু?

মঞ্জুলার পাকামোর কোনো তুলনা হয় না। বললো—মিনুদি শাক দিয়ে ঢেকে রেখেছি, তাই। নইলে আশেপাশে যা বেড়াল?

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

আঠারো বছরে মঞ্জুলার চেহারা নিখুঁত। আর আমার?

কত তাড়াতাড়িই না ফুরিয়ে যাচ্ছি। দুদিন পরে থাকবে কি? আরও দু-একটি ছেলে হলে? আমি অসম্ভব রকম দেহ-সচেতন হয়ে উঠলাম। নতুন একটা কাজ বাড়লো।

মঞ্জুলা আমাকে দেহ-সচেতন করলো, শান্তা আমার চোখ ফেরাতে সাহায্য করলো আমার ঐশ্বর্যের (আমার শরীরে যেটুকু বর্তমান) দিকে। দীর্ঘদিন পরে আবার সৌমিত্রকে মনে পড়লো। কিন্তু না, সে হয় না। সৌমিত্র আমার জীবনে মৃত, তার পুনরুজ্জীবন অসম্ভব।

আমি একদিন প্রসাদকে বললাম, তুমি অফিস থেকে একটু সকাল সকাল ফিরতে পারো না?

ও ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, তাতে লাভ?

এই একটু বেড়ানো-টেড়ানো যায়।

ও এই। হাসলো। বললে, আমি না থাকলেও তোমার বেরোতে বাধা কোথায়? আগে তো সঙ্গী ছাড়াই বেরোতে।

তা বেরোতাম। তবু সঙ্গে থাকবে, দুজনে ঘুরবো এই আর কি?

সে আমার দিকে একবার তাকালো। তারপর দ্রুত আলনার কাছে গিয়ে শার্ট পরতে পরতে বললো, মনুর মাকে টাকাটা দিয়েছো?

এই দেখো, কোথা থেকে কি। তবু ঘাড় নেড়ে জানালাম—দিয়েছি।

সে শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বললো, বাড়িওয়ালা কি ভাড়া চেয়েছে?

না।

চাইতে এলে বলো বাথরুমটা সারিয়ে দিতে। নইলে আমি নিজের খরচায় করে নেবো।

আচ্ছা।

সে তখন জুতোয় পা গলিয়ে দিয়েছে। নোঙরা ন্যাকড়াটা দিয়ে জুতো মুছতে মুছতে বললো, কিছু আনতে হবে নাকি?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একবার শার্টের পকেটগুলো দেখে নিয়ে বললো, রোববার দিন দুজনে বেরনো যাবে, কেমন?

বেশ তাই।

প্রসাদ বেরিয়ে গেলো।

আমি ভাবতে বসলাম, আজ বুধবার, রোববারের সে অনেক দেরি। তবু নিজেকে সান্তবনা দিলাম। এবং মনে মনে সাজ করাতে লাগলাম নিজেকে। সেদিন হলদে শাড়িটা আমি পরবো, হলদে ব্লাউজটাও। ঢিলে খোঁপা, না, ঢিলে নয়, একেবারে কুমারীর সাজে সাজবো। প্রসাদ আপত্তি করলেও আমি ঘোমটা দেবো না, সিঁদুর নয়। এবং গলার হার, হাতের চুড়ি খুলে ফেলবো। একহাতে একখানা চুড়ি থাকবে, অন্য হাতে ঘড়ি।

কতক্ষণ নিজেকে মনের মতো সাজাচ্ছিলাম কে জানে, হঠাৎ ছেলের কান্নায় চমক ভাঙলো। তাই তো, ছেলেকে কার কাছে রেখে যাবো? মনুর মার কাছে? না। মঞ্জুলার কাছে? সে পারবে কেন? তাহলে? ছেলেটাকে দোলনা থেকে কোলে নিয়ে মাই দিতে যাবো, হঠাৎ খেয়াল হলো। ফিডিং বোতলটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে ছেলের মুখে গুঁজে দিলাম।

দোলনার কাঁথাকানিগুলো গুছিয়ে আবার ছেলেকে শুইয়ে দিলাম, ভাবলাম, এখন যদি একবার মঞ্জুলা আসতো, অথবা শান্তা, জিজ্ঞেস করতাম, ছেলেটাকে সামলাতে পারবে কি না কয়েক ঘণ্টার জন্যে।

ওদের কেউই এলো না, ঘরে ঢুকলো মনুর মা। বাসন-কোসনগুলো কলতলায় রেখে ফিরে আসার পর মনুর মাকে বললাম, ও বাড়ির মঞ্জুলা দিদিমণি অথবা শান্তা দিদিমণিকে একটু ডেকে আনবে?

মনুর মা বেরিয়ে গেলো।

মঞ্জুলাকে পায়নি, সে স্কুল থেকে তখনও ফেরেনি, শান্তা বলেছে এই যাচ্ছি। শান্তা আসতে তাকে বললাম। সে এক কথায় রাজী হয়ে গেলো। স্বস্তির

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

কিন্তু শান্তার কৌতূহল প্রচুর। সে জিজ্ঞেস করলো, যাবে তো সেই রোববারে, কিন্তু এত আগে থেকেই উদ্যোগ আয়োজন ?

সে তুমি বুঝবে না, ভাই।

বা, ও কি আমার লজিকের বই থেকেও শক্ত।

হেসে বললাম, তার চেয়ে ঢের ঢের ঢের—

মুখের কথা থামিয়ে শান্তা বললো, ও বুঝেছি। দুজনায় ফূর্তি করতে বেরোবে ?

বললাম, মাছি কি না, গন্ধে টের পেলে।

কিন্তু এত আগে থেকেই আয়োজন কেন ?

যদি তখন তোমাদের পাওয়া না যায়। হেসে বললাম, তোমরাও তো খুব ব্যস্ত। সময় মতো পাওয়া যাবে তার ঠিক কি ?

শান্তা হেসে বললো, সে বৌদি উইক ডেজে, রোববার পুরোপুরি কয়েদী।

আহা হা, কি দুঃখ। বাড়িতে বুঝি খুব কড়া পাহারা ?

কড়া বলতে কড়া। আসলে তো কলেজ পালানো ছাড়া নান্য গতি। একটু থেমে যোগ করলে—ও'দিকে পার্সেন্টেজ ঘাটতি পড়ছে, পরীক্ষার সময় কি যে হবে ?

কেন ঘুষ।

কাকে ?

এই যা, তাও জানো না, ক্লার্ক মশাইকে।

আমার কথায় শান্তা খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি এতো জানলে কি করে ?

হেসে জানালাম, আরে ছো ছো, এ আবার জানতে কষ্ট। একটা কলেজের ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়লেই সব জানা যায়।

তাই বলো।

ও মা, তুমি বুঝি ভাবলে আমি ইতিমধ্যে প্রেমে পড়ে গেছি ?

নয় তো কি ?

হেসে বললাম, ঈশ্বর অতো দয়ালু নয় শান্তা। একটু যদি করুণা ভিক্ষে দিতো।

শান্তা জোরে হেসে উঠলো। বললো, তোমার খুব ইচ্ছে, না ?

তা আর বলতে।

শান্তা বললো, ঠিক একটাকে জুটিয়ে দেবো তোমার সঙ্গে। জানো না তো

ওগুলো কি রকম ঘুঘু !
যথা ? আমি কৌতূহলী হয়ে তাকালাম।
ওরা ধরা দেবে না, শুধু ধরতে চাইবে।
আমি হেসে বললাম, বেশ, বেশ। তার পর—
শান্তা আমাকে জিভ ভেংচে পালিয়ে গেলো। আমি চেঁচিয়ে বললাম, রোববারের কথা ভুলো না যেন।

আকাঙ্ক্ষিত রোববার এলো। সে রোববার না এলেই ভালো হতো। অথচ এমন কিছু নয়। তুচ্ছ একটা ব্যাপার। যে প্রসঙ্গ না উঠলেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না, সেই একটু ব্যাপারই অনেকটুকু হয়ে গেলো। আমার সমস্ত ইচ্ছা সেই তুচ্ছতার আগুনে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেলো। আমাকে অবাক হবার ভাববার সময়টুকুও দিলো না।
শনিবার ও অফিস যাবার পর রীতা এসেছিলো স্কুলের এক বন্ধুর সঙ্গে। রীতা প্রসাদের ছোটো বোন। অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে যাবার সময় দশটা টাকা চাইলে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি ব্যাপার, হঠাৎ টাকার দরকার হলো যে ?
রীতা বলেছিলো, থাকলে দাও, নইলে বাপু দরকার নেই।
কি জন্যে, বলো না।
আছে তোমার কাছে ?
বলেছিলাম, না।
'না' বলেছিলাম মিথ্যে করেই ! আসলে টাকা আমার কাছে ছিলো। আমি ভেবেছিলাম একে তো মাসের শেষ, তার ওপর আমরা কাল বেরবো, যদি কিছু কেনাকাটা করি ! তা ছাড়া প্রসাদের কাছে টাকা নেই আমি জানতাম, সে টাকা রাখে না। যদি দিয়ে দিই, এদিকে হঠাৎ কোন প্রয়োজন পড়লে আবার হাত পাততে যাবে কার কাছে, তার চাইতে থাক ! তার ওপর রীতার যদি তেমন কোনো জরুরী প্রয়োজন থাকতো, নিশ্চয়ই বলতো। যখন সে ততো জোর দিয়ে বলেনি, আমিও সহজে মিথ্যে বলে দিয়েছি। একথা প্রসাদের জানার কথা নয়, আমিও বলিনি।
শনিবার দিন অফিস থেকে সে বেশ দেরি করেই ফিরেছে। অথচ শনিবারের অফিস, সে কোন দুপুরেই শেষ হয়ে যায়। দেরি করে ফেরার কোনো কৈফিয়ৎ আমিও তলব করিনি, সেও দেয়নি। খাওয়াদাওয়ার আগে পর্যন্ত ঘরোয়া

কথাবার্তা হয়েছে টুকিটাকি নিয়ে, রাত্রেও সে কথা ওঠেনি। ভোর বেলা চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলো, কাল রীতা এসেছিলো ?

এসেছিলো। কিন্তু তোমাকে বললো কে ?

কেন, আমি জানলে কোনো অপরাধ হয় ?

তা কেন ; তবু জিজ্ঞেস করছি কি করে জানলে ?

তুমি যখন বলোনি, তখন নিশ্চয়ই অন্য কেউ একজন বলেছে।

কথার ধরণটাই কেমন যেন তেরছা। অথচ আগে সে এভাবে কথা বলতো না, কখনও নয়। ইদানীং তার ব্যবহারের পরিবর্তনের পেছনে কি এমন কারণ থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছিলাম না। তাই আমারও জেদ চেপে গেলো। বললাম, এসেছিলোই তো, কি হয়েছে তাতে ?

কি হয়নি, আমি তাই-ই জিজ্ঞেস করছি ?

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি এমন হতে পারে আমি ভেবে পেলাম না ? আমি বললাম, সে আমার জানার কথা নয় ?

তোমার জানার কথা হবে কেন ? সব আমাকে জানলেই চলবে।

বেশ, তাই জানো। কিন্তু সেকথা গলা বাড়িয়ে আমাকে বলছো কেন ?

স্বভাব যায় না মলে। প্রসাদেরও স্বভাব পাল্টানোর কোন কারণ ছিলো না। সে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বললো, যে টাকাগুলো ছিলো সেগুলো কি তোমার রোজগারের টাকা ?

সে প্রশ্ন ওঠে কেন ? আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললাম।

তা হলে রীতাকে দিলে না যে ?

একে মাসের শেষ, যদি হঠাৎ দরকার হতো ?

সে আমি বুঝতাম।

বেশ, তাহলে এবার থেকে তুমিই বোঝো। আমি টেবিলের টানা খুলে টাকাগুলো প্রসাদের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। বললাম. বোনের প্রতি তোমার এত টান আমার আগে জানা ছিলো না। অত যদি দরদ, কাছে কাছে থাকলেই পারতে ?

কি ?

আমি তেমন অসহিষ্ণু ভাবেই বললাম, বলছি বোনের কাছে গিয়ে থাকলেই পারতে।

মুখ সামলে কথা বলো মিনু। অসভ্যতার একটা সীমা আছে মনে রেখো ?

কেন, তোমার ভয়ে নাকি ?

প্রসাদ এবারে ফেটে পড়লো। হাতের ধাক্কায় চায়ের কাপটা মেঝেয় পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলো। আমি নিষ্পলক সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। প্রসাদ ততক্ষণে আমার মুখোমুখী।

কি, মারবে নাকি?

হয়তো প্রসাদ মুখোমুখী দাঁড়িয়েই থাকতো। আর পারলে না। আমার কথায় তার এতদিনের সংযম ভেঙে গেলো। ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলে আমার গালে। বললো, কি করে মুখ বন্ধ করতে হয় সে আমার জানা আছে।

না, আমি অবাক হইনি। এই-ই প্রসাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অনেকদিনের ক্ষোভ এমনি করেই ফেটে পড়ে, জানি। এবং জানি এ ধরণের ঘটনা একদিন না একদিন ঘটবেই। আমি তবু বললাম, বাহাদুরি অন্দুর পর্যন্তই, আমি জানতাম।

জানতে?

হ্যাঁ জানতাম, এ-ক-শ-বা-র জানতাম। তোমার মতো লোক এর বেশি কি আর করতে পারে?

প্রসাদ একটা বিতিকিচ্ছিরি চিৎকার করে উঠলো, তুমি থামবে, কিনা?

রাগে তখন আমারও গা কাঁপছে। বললাম, না, থামবো না। কি করতে পারো তুমি?

থামবে না?

না!

প্রসাদ আমাকে দু হাতে এলোপাথাড়ি চড়াতে লাগলো। আমি ততক্ষণে একেবারে বোবা। ইচ্ছে হলো ডুকরে কেঁদে উঠি। বলি—ইতর, ইতর, ছোটোলোক। পারলাম না। বললাম, মারো, মারো, আরও মারো, আমাকে মেরে ফেলো। জানতাম একদিন না একদিন তুমি আমাকে মারবেই। এমনি করেই আমি মার খাবো। মারো, আরও মারো, থামলে কেন? না হয় তোমার হাতের মার খেয়েই আমি মরবো। মরবো।

আমি তখন কাঁদছি। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছি।

প্রসাদ ছিটকে আলনার কাছে সরে গিয়ে, শার্ট তুলে নিলো। তাড়াতাড়ি গায়ে গলিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো।

বেলা ক্রমে বাড়ছে। বাড়ুক। সংসারের উপর আর আমার মায়া-মমতা অবশিষ্ট

নেই। কি জন্যে করবো, কার জন্যে করবো। ওই তো স্বামী! রান্নাঘরের দরজা তেমনি খোলা পড়ে রয়েছে। থাক। স্টোভটা জ্বেলেছিলাম চায়ের জল করতে, ওটা নেভানো হয়নি। না হোক, পুড়ুক তেল। উনুনে কয়লা চাপিয়ে আঁচ দিয়েছিলাম এখন ধোঁয়ো দিচ্ছে। দিক। ঘর দোর সব সেই অন্ধকারে তলিয়ে যাক! আর অবশিষ্ট চা-টুকু! ও ঈশ্বর, এ ঘরে যেন আমাকে আর কিছুই হাতে তুলে মুখে দিতে না হয়। যদি দিই, আমি, আমার ছেলের…না না, আমি আমার বাপ ভায়ের…না না, আমি শপথ করবো কোন দুঃখে? শপথ আমি করবো না, কিন্তু আমি মরবো, তবু এ ঘরের কিছুই আমি আর হাতে তুলে মুখে দেবো না, কোনোদিনও না!

আমি বিছানার উপরে সটান শুয়ে পড়লাম।

এবার বাড়ুক বেলা, কি আসে যায় আমার? তা ছাড়া এ সংসারে আমার বলতে কিই বা আছে? কিচ্ছুই না। ওই ছেলে? ও ছেলে আমার কে? যার ছেলে সে বুঝবে, বয়ে গেছে আমার ভাবতে। আমি পর পর অনেক কিছুই ভাবলাম। যদি বাপের বাড়ি চলে যাই, না, সে বড় বিশ্রী হবে। শ্বশুরের ওখানে যদি যাই? তাতে লাভ কি? সেও তো এক কথা। না, একেবারে বেরিয়ে যাবো, যেখানে খুশি, কিন্তু আগে একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। ওকে শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে জীবনের মতো। বুঝিয়ে দিতে হবে, সে গায়ে হাত তোলার যে-সাহস দেখিয়েছে সে-সাহস আদৌ ভদ্রলোকের সাহস নয়। ভদ্রলোকেরা স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে না। তুমি ইতর, তুমি ছোটোলোক, তুমি নীচ। তোমার ঘর করার চাইতে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ঢের ভালো। কাপুরুষ! রাগ হলো তো অমনি গায়ে হাত। কেন, কেন হাত তুলবে গায়ে? কি জন্যে?

কিন্তু আমার এই উত্তেজিত মনোভাব ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি, অনেক যুক্তি ভিড় করছে আমার মনে, এবং স্পষ্ট হচ্ছে আমার ত্রুটি। পাশাপাশি ওর ত্রুটিগুলোও। দোষ দু পক্ষেরই, তবু সে আমার গায়ে হাত তুললো। এর আগেও যে দু-একবার তোলেনি তা নয়, তাতে আকস্মিকতা যত ছিলো তীব্রতা তত ছিলো না, এত ঝাঁজও নয়। তা ছাড়া এত উত্তেজিত ইতিমধ্যে সে আর কখনও হয়নি। শ্বশুর-ভাশুরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর এই প্রথম। কিন্তু এত কেন? আমার হঠাৎ মনে হলো, তার মনের কোথাও আমার ব্যবহার, চলাফেরা সম্পর্কিত একটা সন্দেহ কাজ করছে। এমন কি আমার চরিত্র সম্পর্কেও। কিন্তু সেটা কি ধরণের? হঠাৎ সদর দরজা

খোলার শব্দ হলো। কে এলো? প্রসাদ? এত তাড়াতাড়ি? না, ঘরে ঢুকলো মনুর মা। ঘরের ধোঁয়া এখন অনেক কম।

মনুর মা ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বললে —এই দেখো, উনুনটা দোর গোড়ায় রেখে দিয়েছো গো। ঘরে ধোঁয়া হবে না তো, কি হবে? বিড় বিড় করতে করতে ঘরের বাইরে গিয়ে উনুনটা সরিয়ে দিলো। দিয়ে ফের এলো ঘরে—অ বৌদিমনি, এই সক্কাল বেলায় আবার তোমাদের কি হলো?

কথার কোনো জবাব না পেয়ে কতক্ষণ স্থির হয়ে সে তাকালো। আমি বুঝতে পারলাম, মনুর মা আবহাওয়াটা আন্দাজ করছে। তারপর আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ঘরের মেঝের দিকে তাকালো, কাপ-ভাঙা টুকরোগুলো মেঝেয় তখনও গড়াচ্ছে। চোখ ফেরালো দোলনার দিকে। কাঁথা পাল্টানো হয়নি, মনুর মার অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়তে দেরি হলো না। সারারাত জ্বালিয়ে ছেলেটা এখন ঘুমুচ্ছে অঘোরে। মনুর মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো রান্নাঘরে। নিশ্চয়ই সব চোখে পড়েছে মনুর মার। মনুর মা সব গুছিয়ে রাখছে হয়তো। রাখুক, না-রাখুক আমি উঠবো না।

দরজায় শিকল তুলে দেবার শব্দে বুঝলাম মনুর মা এদিকে আসছে। আমি পাশ ফিরে শুলাম। না, মনুর মা ঘরে এলো না। সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। মনুর মা চলে গেছে। ভালোই হয়েছে। বুঝতে দেরি হলো না, মনুর মার চোখে সব ধরা পড়েছে। না পড়ার কোনো কারণ নেই। এত ঝিমুনো রোববারের সকাল মনুর মা এ বাড়িতে আগে কখনও দেখেনি। কখনও না।

আমি বিছানায় শুয়ে আছি। ভালো লাগছে না, তবু শুয়ে আছি। শুয়েই থাকবো।

যদি ছেলেটা জেগে ওঠে, চেঁচায়, তাহলে? না, তাহলেও আমি উঠবো না। কিছুতেই না।

না, আমাকে উঠতে হলো। দরজায় ছিটকিনি তুলে দেবার জন্যে, যাতে কেউ আর বিরক্ত না করে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ছেলের কান্নায় ঘুম ভাঙতেই পড়ি মরি উঠে পড়লাম। তখন ভর দুপুর। ছেলেকে মাই দিলাম, ঘুম পাড়ালাম। আবার বিছানায় উঠে পা গুটিয়ে বসে রইলাম। এক সময়ে শুয়ে পড়লাম। আবার বিছানায় উঠে পা গুটিয়ে বসে রইলাম। এক সময়ে শুয়ে পড়লাম। ইচ্ছে হচ্ছে আবার কাঁদি, ডুকরে ডুকরে কাঁদি। কি ভাগ্য নিয়েই না এ সংসারে এসেছিলাম।

এতো দুঃখ অসহ্য। অথচ পোড়া কপাল আমার সবই সইতে হচ্ছে? কিন্তু কেন? রীতার কথা না উঠলে কি এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যেতো? কি দরকার ছিলো আমাদের সংসারে রীতার আসার? আর এলোই যদি, কেন এমন একটা সমস্যার সৃষ্টি করলো? কি এমন টাকার দরকার হয়েছিলো তার। আর যদি হয়েও থাকে সে বললেই পারতো। অথচ যতো রাজ্যের ন্যাকামী করে গেলো, কই তেমন করে কিছু তো বললে না। আমার আর চিনতে বাকি নেই ওসব রীতাদের? অথচ ওর জন্যেই এতো খিটিমিটি। কি আশাই না করে রেখেছিলাম। দুপুরে খেয়েই দুজনে বেরবো, ঘুরবো ইচ্ছে মতো। কতোদিন বাইরে বেরোইনি। সব আমার চুলোয় গেলো। খাওয়া গেলো, বেড়ানো গেলো। তার ওপব ওই লোকটা, যে অসুখের সময়ও ভাতের বায়না করতে ছাড়ে না, সে এখন কোথায় ঝিমুচ্ছে না ঘুরছে কে জানে? অথচ রোববার দিন পরিপাটি খাওয়া তার চাই-ই। আজ, এখন কি খাচ্ছে? খাচ্ছে না হাতি, দেখো গে, কোথায় কোন পার্কের বেঞ্চিতে বসে বিড় বিড় করছে। ভালোই হয়েছে। বুঝুক। ভালো করেই বুঝুক।

দুপুর ভাঙলো।

আবার সদর দরজা খোলার শব্দ। কে এলো। না প্রসাদ নয়। ওর পায়ের শব্দই আলাদা। তাহলে? আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। দরজায় ঘা পড়লো না। রান্না ঘরের শিকল খোলার শব্দ হলো। নিশ্চয়ই মনুর মা। ও কি করতে এসেছে?

বাসনকোসন, হাঁড়ি-কড়াই নাড়ার শব্দে বুঝলাম মনুর মা রান্না চড়াচ্ছে। কার জন্যে? মরুকগে, যাই রাঁধবে রাঁধুক, আমার কি? এ বাড়িতে আমি আর জলগ্রহণ করবো না। প্রসাদ ক্ষমা চাইলেও না।

বিকেল ফুরোচ্ছে। সন্ধ্যা হলো বলে। না, মনুর মা-ই ওদিকে নড়ছে চড়ছে। আর কেউ নেই। কেউ না। শান্তা না, মঞ্জুলা না, সরিৎ, নারাণ কেউ নয়। অথচ ওরা তো রোববার আসে। তা ছাড়া শান্তাকে যে ছেলে আগলাতে বলেছিলাম। কেউ এলো না কেন? ওরা কি জানতে পেরেছে? ছি ছি, ওরা কি ভাববে, কি মনে করবে? বয়ে গেছে ওদের মনে করায়। ভাবুক গে। যত খুশি ভাবুক। আমি বাতি জ্বালবো না, ঘরে ধুনো দেবো না, লক্ষ্মীর পটে

আলোও না।

ছেলেটাকে পাশে নিয়েই শুয়ে রইলাম।

সদর দরজা বন্ধ হলো। মনুর মা চলে যাচ্ছে। কিন্তু সে একবারও ডাকলে না তো। বুড়িটা যে কি! ঘরের মধ্যে আমি বেঁচে আছি কি নেই তাও জানলে না। না, প্রয়োজন ছিলো না। ছেলেকে বকছিলাম যখন তখন আমার গলার স্বর নিশ্চয়ই মনুর মার কানে গেছে।

মনুর মা চলে যাওয়ার একটু পরেই আবার সদর দরজা খোলার শব্দ হল। কে যেন আলতো পায়ে আসছে। নিশ্চয়ই প্রসাদ। দরজায় আঙুলের টোকা দিচ্ছে আস্তে আস্তে। না দরোজা খুলবো না, কিছুতেই না। প্রসাদ ডাকছে ডাকুক।

কিন্তু হঠাৎ মনে হলো, এ ঘর তো ওর। দরজা বন্ধ করে রাখার কি অধিকার আমার! না, দরজা খুলে দেবো, তারপর বোঝা পড়া। একটা হেস্তনেস্ত। দরজা খুলে দিলাম।

ও নিজের হাতে আলো জ্বাললো। উঃ কি ছিরি হয়েছে ওর মুখের, এতক্ষণ কোথায় কাটিয়েছে কে জানে! এই তো বীরপুরুষ, একবেলাতেই চিমসে গেছে। কিন্তু না, আমার এ সহানুভূতি কেন? আমি ছেলেটাকে দোলনায় শুইয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাব, প্রসাদ আমাকে আটকালো।

বললাম, পথ ছাড়। খবরদার আমাকে ছোঁবে না।

প্রসাদ তেমনি পথ আগলে রইলো। বললো, এখনও রাগ পড়লো না মিনু। বেশ ক্ষমা চাইছি।

ক্ষমা? আমি ওর দিকে তাকালাম আমি, আমি ক্ষমা করবার কে? তুমি ঠিকই করেছো। কিন্তু আমাকে যেতে দাও।

কোথায় যাবে বলো তো?

যেখানে খুশি। তাতে তোমার কি?

আমার কিছু নয়?

না।

প্রসাদ তেমনি পথ আগলে দাঁড়িয়ে বললে, আবার ঝগড়া করবে মিনু? বেশ তুমি একলাই করো। আমি কিন্তু ক্ষিদেয় আর কথা বলতে পারছি না।

সে আমার ভাববার কথা নয়।

ও!

প্রসাদ পথ ছেড়ে দিলো। আমি বেরিয়ে বাথরুমে গেলাম। সারাদিন স্নান খাওয়া হয়নি। শরীরটা কি ভয়ানক দুর্বল লাগছে। লাগুক। বাথরুম থেকে বেরুতেই রান্নাঘরের আলো চোখে পড়লো। উঁকি দিয়ে দেখলাম ভাত তরকারী রান্না করে রেখেছে। কিন্তু কি করে? বাজার করলো কে? নিশ্চয়ই মনুর মা। বুড়িটা যে কি? কিন্তু না, রান্না হলেও আমার কি? আমি ঘরে ফিরে এলাম। প্রসাদ চেয়ারে মুখ গুঁজে বসে আছে। কি? কিছু ভাবছে সে? নাকি খু-উ-ব খিদে পেয়েছে? বুঝুক এবার, আচ্ছা করে বুঝুক।

আমি ধীরে ধীরে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

শুভ সেই ঝগড়ার ঘটনার আরও কিছু আছে। সে পরে বলছি। আগে তোমাকে বলে নিই এ ঘটনার ওপর আমি এত জোর দিচ্ছি কেন? কেন এত ছড়িয়ে ছিটিয়ে লিখছি? তা ছাড়া তুমি বলতে পারো অনেকদিন আগের ঘটনার এতো পুঙ্খানুপুঙ্খ আমি মনে রাখলাম কি করে? শুভ, এ তো সেদিনের ঘটনা, আমি ইচ্ছে করলে ফুলশয্যার সেই রাত্রির খুটিনাটি সব তোমাকে বলতে পারতাম। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিলো না। এ ঘটনার আছে। কারণ বিবাহিত জীবনে ঝগড়া অনেক রকমের হয়। অনেক সময় মেঘের গর্জনে মনে হয় আকাশ বুঝি ভেঙে পড়বে, কিন্তু মজা কি জানো শুধু গর্জনই হয়, আর কিছুই হয় না। আবার বিনা মেঘ-গর্জনে আকাশ ভাঙেও। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস এ ঘটনা থেকেই তুমি তোমার একটা জটিল এবং মুখ্য প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব পেয়ে যাবে। যদি না পাও, শুভ, সে তোমার আমার উভয়েরই দুর্ভাগ্য।

আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রসাদ আস্তে আস্তে মাথা তুলে আমার দিকে তাকালো। তার চোখ লাল। মুখটা কি ভয়ানক বিশ্রী দেখাচ্ছে। চুলগুলো উস্কুখুস্কু। সে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি চাও?

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

বেশ, তোমার যেখানে ইচ্ছে তুমি যেতে পারো, আমি বাধা দেবো না। ইচ্ছে হয় এখনি চলে যাও, কিন্তু আমার শেষ কথা কাল সকালে আমি আর এর জের টানতে চাইনে।

খুব ভালো কথা। তাই হবে। কাল সকালেই আমি চলে যাবো।

চলে যাবে? একটু চমকে সে আবার স্থির হলো। হ্যাঁ চলে যাও, কিন্তু, প্রসাদের শরীর থর থর কাঁপছে। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। পায়ে পায়ে

এগিয়ে এলো আমার সামনে। বললো, হ্যাঁ তার আগে সে আমার ডান হাতটা শক্ত করে ধরলো এবং মট্ মট্ করে শাঁখাটা ভেঙে দিলো। আমি কিছুই বললাম না। বাঁ হাতের শাঁখাটাও সে সেভাবেই ভাঙলো। তারপর সে আমার চোখের দিকে না তাকিয়েই দ্রুত আমার কপালের সিঁদুর মুছে দিয়ে বললো, মনে করো তোমার স্বামী নেই, সে মরে গেছে।

আমি একেবারে থ। একটি টুঁ শব্দও করতে পারলাম না। মনে হচ্ছে আমি যেন জমে পাথর হয়ে যাচ্ছি। আমার শরীরে যেন একটুও সাড়া নেই।

সে পাশের ঘরে চলে গেলো। সেটা ঠিক ঘর নয়, ঘরের চাইতে ছোটো, অথচ বারান্দাও নয়! সেখানে একটা খাট আর টেবিল পাতা আছে। বিছানাপত্র কিছুই নেই। শব্দ হতেই বুঝলাম সে সেখানে শুয়ে পড়েছে।

সদর সেই-ই বন্ধ করেছিলো, রান্না ঘরে শেকল তুলে দিয়ে গেছে মনুর মা। এ ঘরের দরজায় ছিটকিনি দিয়ে বাতি নিবিয়ে দিলাম। এবং আমি খাটে শুলাম না, মাথার নিচে হাত দিয়ে মেঝের উপর শুয়ে পড়লাম।

ক্রমে রাত বাড়লো। ঘুম আসছে না, আসবেও না। অনেক অনেক ভাবনা আমার মাথার মধ্যে কিলবিল করছে। ভাবছি, আমার ভবিষ্যৎ। কোথায় যাবো কি করবো। অথচ কিই বা জানি, কি বা বুঝি? কোন ডিগ্রি নেই যে চাকরি করবো। তা ছাড়া চাকরী পাওয়া কি অতই সহজ? হঠাৎ, হঠাৎই আমার কান খাড়া হয়ে গেলো। ও কি!

আমার স্পষ্ট মনে হলো প্রসাদ কাঁদছে। মনে হচ্ছে সে চুল ছিঁড়ছে তার মাথার। আর কি যেন বলছে। ভীষণ অস্পষ্ট, বোঝা যাচ্ছে না।

আমি উঠলাম। সন্তর্পণে এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। ও ঘরের দরজা দেয়নি প্রসাদ। আমি আরও এগোলাম। সে কি ক্ষিদেয় কাতরাচ্ছে? না তো? ক্ষিদেয় নয়? তা হলে? আমি শুনতে পেলাম সে ধিক্কার দিচ্ছে নিজেকে, তার ভাগ্যকে। সে কাঁদছে।

আর পারলাম না। আমি ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, এ্যাই শুনছো? না, সে শুনবে না, কিছুতেই না। বললো, তুমি চলে যাও, বিরক্ত করো না। করবো, একশোবার করবো? আমি ওকে চুমো খেলাম, কেন? যখন মেরেছিলে তখন মনে ছিলো না? একটুও হাত কাঁপলো না। আমি ওর গালে মুখ রেখে বললাম, আমার লাগেনি, লাগে না। তুমি আমাকে অমন করে মারতে পারলে? কি করে পারলে! বিশ্বাস করো আমি মরতাম, পারিনি, মন স্থির করতে

পারিনি। আমি তখন কাঁদছি। আমার চোখের জল আমার গাল বেয়ে ওর মুখেও গড়াচ্ছে। বললাম, তোমার জন্যে, তোমার ছেলের জন্যে, নইলে—

প্রসাদ আমাকে সজোরে জড়িয়ে ধরলো। বললো, আর কখনও এমনটি হবে না।

না, হবে না। এমন কথা কতো শুনলাম তোমার মুখে। শুনতে শুনতে কান পচে গেলো।

বিশ্বাস করো ময়ী, আর হবে না।

কি বললে ? আমি মুখ তুলে ওকে দেখতে চেষ্টা করলাম অন্ধকারে।

জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বাস করো কি ?

ও ! প্রসাদ একটু হাসলো। বললো, আমি তোমাকে এবার থেকে ময়ী বলে ডাকবো। মিনুটা ভারী ঝগড়াটে।

আমি কিন্তু ঝগড়া করবো।

করো, তখন টের পাবে, আজকের মতো। যখন—

অসভ্য।

তারপর দুজনে উঠলাম। সেই রাত্রে চুপি চুপি রান্নাঘরে গিয়ে খেলাম। উঃ বাব্বা কী রাক্ষুসে ক্ষিদেই না পেয়েছিলো!

শুভ, তারপর কয়েকটি বছর আমার তেমন কোনো ইতিহাস নেই। আমি কখনও মিনু, কখনও ময়ী, কখনও মৃন্ময়ী। সে সময়ে সেই বিদুষী প্রতিবেশিনীর সাক্ষাৎ পেলাম, তার কথা তো আগেই বলেছি। ইতিমধ্যে আরেকটি ছেলে হয়েছিলো, সেটা দু বছর বয়সে মারা গেলো। বড়োটার বয়স তখন চার। ছেলেটা মারা যাবার এক বছর পরে মণ্টি হলো। মণ্টি আমার সব পূর্ণ করে দিলো। প্রসাদকে বললাম, আর চাই নে। প্রসাদ হাসলো।

মণ্টির যখন তিন বছর বয়স তখন তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তখন আমার বয়স চব্বিশ।

না, শুভ, অত তাড়াতাড়ি সব বলা যাবে না। আরও কিছু কথা আছে, আগে-ভাগে গুছিয়ে নিই। নইলে পরে আর বলা হবে না।

শুভ, কয়েকটি নয়, গুনে দেখলাম পুরো পাঁচ পাঁচটি বছর। এই পাঁচ বছরে আমার ইচ্ছের, আমার আকাঙ্ক্ষার কি রঙ বদল হয়নি। এ পাঁচ বছর কি আমি একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে ফিরেছি ?

না, শুভ, এই পাঁচ বছরে আমার জীবনে অনেক কিছুই হয়েছে। অনেক পুরনো আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু হয়েছে, অনেক নতুন ইচ্ছের জন্ম। অবশ্য স্পর্শসহ ঘটনা বলতে ছেলের মৃত্যু, মেয়ের জন্ম। তাছাড়া দাম্পত্য জীবনের ছোটোখাটো কলহ-বিবাদ, মানাভিমান ইত্যাদি। অথবা কিছু অসুখ-বিসুখ, কখনও সখনো আর্থিক বিপর্যয়। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা আমার ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন, আমার মনোজগতের তুমুল ওলোটপালট। এই পাঁচ বছর আমি এক বিশাল চক্রব্যূহের জটিলতায় কখনও পথ হারিয়ে ঘুরে মরেছি, কখনও পথ পাওয়ার উল্লাসে নতুন ভাবে বাঁচতে চেয়েছি? এ পাঁচ বছর আমি আমার ভেতরে বাইরে নিরন্তর ছুটোছুটি করেছি, কখনও ক্লান্ত হয়েছি, কখনও উচ্ছল। ক্রমে আমি শিখেছি বুদ্ধির হাত ধরে হাঁটতে, যুক্তির ছায়ায় ছায়ায় চলতে। অর্থাৎ এ কয় বছর আমার কেটেছে কার্য এবং কারণের সম্পর্ক খুঁজতে। আমি নিজেকে বুঝতে চেষ্টা করেছি, বোঝাতে। ফলে যার জন্ম হলো সে মিনু, মৃন্ময়ী, ময়ীর কেউ নয়, সে অন্য একজন। তার নাম জানি নে, অথচ তাকে চিনি।

এ পাঁচ বছর তার জন্মের এবং পরিণতির ইতিহাস। আমি তাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। আজ তোমাকে যে চিঠি লিখছে, এ তারই জন্মের কথা। তুমি তাকে নিশ্চয়ই অবহেলা করতে পারো না। দোহাই শুভ, তাকে অবহেলা করো না। সে যে ঋতুর মতোই একজন, অথচ যে কোনোদিন ঋতু নয়, ছিলো না।

আগেই বলেছি, প্রসাদ আমার শাঁখা ভেঙে দিয়েছিলো, এবং সিঁদুর মুছে দিয়ে বলেছিলো, মনে করো তোমার স্বামী নেই, সে মরে গেছে। জানি, তীব্র উত্তেজনার মুহূর্তে সেই কাজ আর কথা বলেছিলো প্রসাদ। আমি জানি। তবু শুভ, আমি সে-ঘটনা ভুলতে পারিনি।

আমি হিন্দু-ঘরের বউ। শাঁখা-সিঁদুরের সংস্কার আমার রক্তে, আমার মজ্জায়। ওই শাঁখা-সিঁদুরে আমার বধূ-পরিচয়, আমাকে বরণ করা হয়েছে ওই শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে। প্রতিমার পায়ে তেল সিঁদুর দিতে গিয়ে, সেই উৎসর্গিত সিঁদুর ছুঁইয়েছি কপালে, সিঁথিতে, শাঁখায়। বড়োরা কপালে শাঁখায় সিন্দুর দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন, বলেছেন, জন্ম এয়োস্তি হও। শুভ, সেই শাঁখা ভেঙে দিয়েছে প্রসাদ, সিঁদুর দিয়েছে মুছে। বলেছে, মনে করো তোমার স্বামী নেই, সে মরে গেছে। সেদিন আমি থ হয়ে গিয়েছিলাম। অবশ, অসাড়। সেদিন আরও কিছু আমার মনে হয়েছিলো, তখন বুঝিনি, পরে বুঝেছি। আমার ভেতরটা শুকিয়ে গিয়েছিলো, ভয়ে, উৎকণ্ঠায়, এবং এক সর্বনাশা

অমঙ্গলের আশঙ্কায়। আমার মনে হয়েছিলো এক সর্বগ্রাসী হাহাকার আমাকে গ্রাস করবে বুঝি? সে রাত্রে সব মিটমাট হয়ে গেলো তবু আমার ভয় কাটলো না। তারপর প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত আমি অকল্যাণকর কিছুর প্রতীক্ষা করেছি। কিন্তু কী আশ্চর্য তেমন সর্বনাশা কোনো অঘটনই ঘটলো না। শুভ, শাঁখা-সিঁদুরের এবং তার সংস্কারের মৃত্যু হলো। আর আমি শাঁখা কিনিনি, পরিনি। অবশ্য সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছি কিছুটা অভ্যাসের বশে, কিছুটা কালো চুলের মাঝে লালের সৌন্দর্যের জন্যে। না দিলে সিঁথিটাকে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগতো। কিন্তু কপালে? না কপালে কুমকুমের টিপ দিয়েছি, আরও নানা রঙের, সিঁদুর দিইনি।

শুভ, অজস্র সংস্কারের জালে আবদ্ধ হিন্দু-ঘরের বউয়ের জীবনে এ অভিজ্ঞতা একটুখানি নয়, এ অনেকটুকু।

এমনি আরও অনেক টুকিটাকি অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি শুভ। ধরো না কেন আমার দুবছরের ছেলেটা যেদিন মারা গেলো, সেদিনের কথা। সেদিন প্রসাদ আমাকে কি বলেছিলো জানো? বলেছিলো, না শুভ, প্রসাদের বলা সেই বিশেষ কথাটা সেভাবে লিখতে পারবো না। ঘুরিয়ে লিখছি। বলেছিলো। না শুভ, যা বলেছিলো তাই-ই লিখি। রুচিতে বাধবে? বাধলোই বা। তা ছাড়া সে কথা যে অন্যভাবে লেখা যায় না। বলেছিলো, ছেলে বিয়োলেই মা হয় না, মা হনেওয়ালা মেয়েলোক অন্য জাতের, তারা তোমার মতো নয়।

আমি শুধু ছেলে 'বিইয়েছি' মা হতে পারিনি। শুভ, এর চেয়ে সে যদি আমার গলায় পা দিয়ে আমার দম বন্ধ করে মারতো আমি একটুও আশ্চর্য হতাম না। কিন্তু এ যে অসহনীয়। কোথায় ত্রুটি ঘটেছে আমাব? কিসে?

আমার চার বছর বয়সের ছেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, তবু আমার স্বামী আমাকে এ কথা বললো, কেন বললো? অথচ তখন কি জবাব দেবো প্রসাদের কথার? মৃত ছেলের শবদেহ তখনও আমার কোলে, একটু পরে এ ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, আর কোনোদিন আমি তাকে দেখবো না, কোনো দিন সে আমাকে আর আধো আধো গলায় মা ডাকবে না, বলবে না, তুমি বড়ো দুষ্টু। বলবে না, আমি খাবো। বলবে না। শুভ, সেদিন যদি সারা বাড়িটা আমার মাথার উপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তো, যদি সবাইকে নিয়ে আমি চিরদিনের মতো তলিয়ে যেতে পারতাম, ভালো হতো, আমি ভীষণ খুশি হতাম। কিন্তু তা হলো না। এক সময় প্রসাদ ছেলেটাকে কোল থেকে ছিনিয়ে

নিয়ে গেলো, শেষবারের মতো ওকে আদর করার সময়টুকুও দিলো না। শুভ, আত্মঘাতী হতে পারতাম, পারতাম সব কিছুতে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরতে। পারিনি। পারিনি, কারণ, জীবনটাকে তখনও জানতে অনেক বাকি।

প্রসাদ ফিরলো। তারপর কয়েকটা দিন কোনো কথা নয়। হয়নি। আমরা যেন অনেক দূরে সরে গেছি। যেটুকু যোগাযোগ তার মাধ্যম ওই চার বছরের ছেলে।

এর কয়েকদিন পরে আমি বাপের বাড়ি চলে গেলাম। ফিরলাম মাস খানেক পরে। প্রসাদ গিয়ে নিয়ে এলো।

শুভ, আমার প্রথম মা হবার কথা বলেছি। তার পরের দু বছর কেটেছে এ ছেলেকে নিয়ে। তার পর দ্বিতীয়বার মা হলাম। ছেলেরা আমার অবকাশকে ভরিয়ে দিলে। তখন সে কী অহংকার আমার! কত ঘোড়া ছুটিয়েছি তেপান্তরের ওপর দিয়ে, কত ধুলো উড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। পর পর দুটো ছেলে হবার জন্যে কতজন মুখ বাড়িয়ে বলেছে, বড়ো ভাগ্যবতী মেয়েটা। একেবারে দু-দুটো রাজপুত্তুরের মা।

বলো, গর্ব হয় কি না? তখন শান্তাদের মঞ্জুলাদের দিকে তাকিয়ে করুণা হয়েছে আমার। মনে মনে সৌভাগ্যের চূড়ো ছুঁয়েছি কতোবার। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার সইলো না। একটা আমাকে ছেড়ে গেলো। সে কি আমার পাপে?

ভাবতে বসলাম। কুলহীন, কিনারাহীন ভাবনার গভীরে ডুবেও কোনো তল পেলাম না। কোনো অন্যায় তো আমি করিনি, জানিত কোনো পাপ? সৌমিত্রর সঙ্গে মেশা? তাকে যদি পাপ বলো তা হলে বড়ো ছেলেটা মরলো না কেন? সে সব তো ঘটেছিল সে সময়। না, কোনো পাপ আমি করিনি, তবু আমার ছেলেটা মরলো। এতে আমার দোষ কোথায়? কিন্তু প্রসাদ দায়ী করলো আমাকেই। কেন করলো? অবিশ্বাস, সন্দেহ?

আমি তখন মরিয়া।

কোথায় উড়ে পুড়ে গেলো সংখ্যাহীন ঠুনকো সংস্কার। আমি ঠিক করে ফেলেছি মনে মনে। বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, কোনো কিছুরই দাম পাওয়া যাবে না এ সংসারে। না বিশ্বাসের মূল্য, না ভক্তির, না ভালোবাসার। তা হলে অপেক্ষা কিসের? কিন্তু কি করবো?

শুভ, দমে গেলাম। সত্যিই তো কি আমি করবো। আমি রাগে ফেটে পড়তে

পারি। ক্রোধে অন্ধ হতে পারি, হিংসায় ঈর্ষায় জ্বলতে পারি। তার বেশি কি আমি করতে পারি?

ইতিমধ্যে বয়স আমার বেড়েছে, অভিজ্ঞতাও। আমি ক্রমশ চোখ মেলেছি।

একটি পরিবারের ইতিহাস বলি, তা হলে ভালো বোঝাতে পারবো। চিনুদের পরিবারই এ পাড়ার সবচেয়ে বনেদী ঘর। ওরা যখন এখানে এসেছে তখন এ অঞ্চলে ভদ্রলোকের বাস ছিলো না। পশ্চিমের এলাকা জুড়ে ছিলো মল্লিক বাগান বস্তি। ওটা পুরো মুসলমান এলাকা। তার পরেই বিরাট একটি রাস্তা। পূব দিকটায় রেল কলোনী। উত্তরের বড় নর্দমার ধার পর্যন্ত পোড়ো জমি, অজস্র শেয়াল কাঁটার গাছ আর নোঙরায় ভর্তি। সেখানেই দুটো খুঁটির 'পরে একটা চওড়া টিনে লেখা ছিলো 'সাইট ফর জনসন আয়রণ ইণ্ডাস্ট্রি'। অবশ্য জনসন আয়রণ ইণ্ডাস্ট্রীর পত্তন কোনো দিন এখানে হয়নি, জমিটা হাত বদল হয়ে গিয়েছিলো কুণ্ডুদের হাতে। তারও পরে রামচাঁদ লক্ষ্মীচাঁদ আগরওয়ালার। সে অনেক পরের কথা। দক্ষিণ দিকটায় যেখানে বিরাট ঝিলটা আছে তার পাড়ে ছিলো কয়েক ঘর ধোপা, হিন্দুস্থানী মজুর আর গাড়োয়ানের বাস। পাণ্ডববর্জিত এখানে অর্জুন খাস্তগীর প্রথম জমি কিনলেন। ভদ্রলোকের পায়ের ধুলো পড়লো। বিরাট বাড়ি তৈরি করে সপরিবারে উঠে এলেন। লোকে অর্জুন খাস্তগীরকে লাট্টুবাবু বলতো। লাট্টুবাবুই আশু মিত্তিরের বাবা নাড়ু মিত্তিরকে এনে বসালেন পাশে। ঝিলের ধার থেকে পোড়ো জমির সীমানা পর্যন্ত এঁরা দুজনে কিনে নিলেন। তার পরে ক্রমে ভদ্রলোকের বসতি বাড়লো। লাট্টুবাবু যখন মারা যান তখন তাঁর সাতটি ছেলে পাঁচটি মেয়ে, অনেকগুলো নাতি নাতনী। লাট্টুবাবুর কাজ কি ছিলো তা কেউই জানতো না, লোকে নানা কথা বলতো। হাত দুটোকে সামনের দিকে বাড়িয়ে বলতো, ধামা ধরা। ধামা ধরুন আর যাই ধরুন এক জীবনে প্রচুর সঞ্চয় করেছিলেন তিনি। কিন্তু পরবর্তী পুরুষ কয়েক বছরেই তা ফুরিয়ে দিলো। তখন নাড়ু মিত্তিরের দোর্দণ্ড দাপট। নতুন টকী খুলেছেন, বাস চলছে সাতটি লাইনে। তার উপর লোহার ব্যবসা। চিনুর বাবা-কাকারা তখন নাড়ু মিত্তিরদের সঙ্গেই উঠতো বসতো। নাড়ু মিত্তির মারা গেলে তার ছেলেদের সঙ্গে। ভোলা মিত্তির অবশ্য হিশেবী, কানু মিত্তিরও। যেটুকু ভাব ছিলো, আছে সবটাই আশু মিত্তিরের সঙ্গে।

ভদ্রলোকের পাড়া আরও বড়ো হলো। মল্লিকবাগান বস্তি উঠে গেলো. সেখানেও ভদ্রলোকেরা জাঁকিয়ে বসলো। এখন পুরোদস্তুর ভদ্র এলাকা। এতো বড়ো পাড়ায় চিনুদের সঙ্গে হৃদ্যতা একমাত্র আশুবাবুদের। পাড়ার লোকদের সঙ্গে চিনুরা কথা বলে না। চিনুরা বলে, কথা বলার মতো লোক কোথায় পাড়ায়। সব তো ভুঁইফোড়ের দল। আভিজাত্য নেই, রুচি নেই, এদের সঙ্গে আমাদের ঠিক পোষায় না। পাড়ায় কিন্তু অন্য কথা প্রচারিত। বলে, মিত্তিরদের পুষ্যিদের সঙ্গে আমাদের বনবে কেন? অথচ চিনুর বাবা বলতেন, অবশ্য প্রকাশ্যে নয়, আড়ালে, বাবা জলের দামে নাড়ু মিত্তিরকে জমি বেচেছিলো তাই, নইলে মিত্তিরদের এখানে আসতে হতো না। আড়ালে যাই বলুক প্রকাশ্যে চিনুর বাবা কাকাদের কিন্তু আশু মিত্তিরের মতেই মত। লোকে বলে, মোটেই না। চিনুর বাবা কাকারা করে কি? ওই তো সাত ভাইয়ের একজন মাত্র পোর্ট কমিশনে চাকরী করে। আর চিনুরা দু ভাই। এতো বড় সংসারটা চলে কি করে? অথচ চাল কতো। চিনুর দুই কাকা প্রতিদিন বেরোয় যেন অফিস যাচ্ছে। আসলে দৌড় আশু মিত্তিরের গদী। আর শনিবারে? সব ভাই-ই আশুবাবুর পার্ষদ।

চিনুদের পরিবারটা সত্যিই রহস্য। বৈঠকখানা ঘরের সীমা ছাড়লেই সবটা অন্ধকার। ইটের আড়াল। বাইরের বড়ো বড়ো কারুকার্য করা থামগুলোয় যে পরিচয়, পলেস্তারাহীন ভেতরের ইটের দেওয়ালটা যেন তার মূর্তিমান প্রতিবাদ। তবু সবটুকু আমি বুঝি নে। অবশ্য চিনুর মা-কাকীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, সে সামান্যই। যদিও চিনুর বোনেরা আমার বেশ অন্তরঙ্গ ছিলো। কিন্তু সে অন্তরঙ্গতা বিষয়ীর নয়, সমবয়সীর। ফলে ওদের পরিবারের রহস্য অনেকটাই শোনা। কিন্তু ক্রমশ সব স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। আশু মিত্তিরের অবস্থা এখন বেশ খারাপের দিকেই। অনেকগুলো বাড়িই হাতবদল হয়ে আগরওয়ালাদের হাতে চলে গেছে। পুরনো টকি বন্ধ করে নতুন সিনেমা করেছিলো, তাও দেনার দায়ে ব্যাঙ্কের হাতে। লোহার ব্যবসাও ডুব ডুব। শুনলাম চিনুদের বাড়িও হাতবদল হবে। অবশ্য ওরা বলছে—পরিবার বড়ো হয়ে গেছে, জায়গায় কুলচ্ছে না। হবেও বা। ও হ্যাঁ, একটি কথা ভুলে গিয়েছিলাম, আসলে চিনুরা এখন আর যৌথ নয়। রান্নাটা এক জায়গায় হয় বটে, আর সব ভিন্ন।

শুভ, এ কাহিনী কেন বললাম? শুধু কি প্রতিবেশী-সংবাদ দেবার জন্যে? না

শুভ, প্রতিবেশীদের জন্য আমার উদ্বেগ অত্যন্ত অল্প। আমি এ কাহিনী বলেছি, কারুকার্য-করা বৈঠকখানার থামে যে পরিচয়, তার পরের পলেস্তারা-হীন ইটের দেয়ালের পরিচয় যে অন্য, এটুকু বোঝাতে। এ শুধু অর্জুন খাস্তগীরের বাড়ির নয়, এ আমাদের গোটা সমাজের।

শুভ, আমার চোখ খুলতে সাহায্য করেছেন সেই বিদুষী প্রতিবেশিনী, আমি যদি তাঁর প্রতি সহজ হতে পারতাম, তাহলে এ সব কোনোদিন জানা সম্ভব হতো না। জানতে পারতাম না কিসে কি হয়, কেন হয়? আজও ঠিক ঠিক জানি নে, তবু আন্দাজ করতে পারি। সেই বিদুষী প্রতিবেশিনীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর প্রতি ঈর্ষাই আমাকে, আমার মনকে শিখতে বাধ্য করলো। আমি অনেক পড়লাম। বই যাকে বলে তা নয়, যাকে কেতাব বলে তাই-ই। ওগুলোর ভার যতো, ধারও ততো। কি অমানুষিক পরিশ্রমই না করেছি প্রতিদিন। কিন্তু বই থেকে কতটুকু জানা যায়, শুভ? বই থেকে কিছুতেই জানা যায় না সরিৎ-এর বাবা নরেনবাবু অতো রাত্রে বাড়ি ফেরেন কেন? কেন দত্তদের বড়ো মেয়ে শীলা কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না? কেন নারানের দিদিকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দেয়া হয় না? কেন সন্তোষ হঠাৎ স্যুট কোট টাই পরে বাড়ির আর দশজনের থেকে আলাদা হয়ে চলে? শুভ, এ সমস্ত বই পড়ে শেখা যায় না! এ সব দেখতে, শিখতে সাহায্য করেছে পল্লব। পল্লব দিনের পর দিন বই জুগিয়েছে আমাকে, বুঝিয়েছে। অথচ এ পল্লবই আমার জন্যে কি দুঃসহ কলঙ্কেরই না ভাগী হয়েছে। কিন্তু না, সে আমার আরও অমর্যাদা হবে এই ভয়ে একটিও প্রতিবাদ করেনি, করলেও কেউ বিশ্বাস করতো না, পল্লব জানতো। সে সরে গেছে। সে কথা আগে বলেছি। এখন বলি, পল্লব আমাকে অনেক অনেক কিছু শিখিয়েছে। আমি যে শুধু মৃন্ময়ী নই, আমি যে অজস্র, এ-পাঠও অনেকটা তার কাছে থেকেই পাওয়া। বিদুষী প্রতিবেশিনী আমার মধ্যে কৌতূহলের জন্ম দিয়েছিলেন, পল্লব সে কৌতূহলকে স্থায়িত্ব দিয়েছে। সে যে কতো কিছু জোগান দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। একদিন একটি পত্রিকার কাটিং এনে ফেলে দিলো। বললো, পড়ে দেখো কি লেখা আছে। পড়লাম। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ। যুবকদের অনাচারে দেশ জাহান্নামে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে নীতি-রুচির কোনো বালাই নেই। অথচ লেখক বলছেন, আমাদের যৌবনে গুরুজনদের সম্মুখে কোন গর্হিত কাজ করা দূরে

থাক, করার কথা ভাবতেও পারিনি। তখন প্রতিটি যুবক ন্যায্য শ্রদ্ধা গুরুজনদের অবনত মস্তকে দিয়েছে। আর এখন, যুবকরা বাচাল, নীতিহীন। সারাক্ষণ নেশায় মত্ত, রাত্রি যাপন করছে গণিকালয়ে ইত্যাদি।

পল্লব জিজ্ঞেস করলো, কি বুঝলে?

আমি ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালাম।

পল্লব একটু হাসলো। বললো, ঠিক যে ধরণের কথা আমাদের গুরুজনরা আমাদের বলছেন সে ধরণের কথা নয়? অথচ দেখো, এ হলো উনিশ শ ষাট সাল, আশী বছর আগের ঘটনা। অর্থাৎ এ-কথাগুলো আমাদের পিতামহরা আমাদের পিতাদের উদ্দেশ্যেই বলেছেন। নয়?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

শুধু তাই নয়, ভেবে দেখো, ওরা কি কি অনাচার করতো? আমাদের সিনেমা, খেলা-ধুলো-রাজনীতি-প্রেম এঁদের এই অনাচারের কাছে কতো নগণ্য, কতো তুচ্ছ। তবুও—

আমি ওকে থামিয়ে দিলাম।

বাঃ বলতে দাও। না হয় বাবা-কাকাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলবো না, কিন্তু নিজেদের কথা কিছু বলি। জানো একটি প্রবাদ আছে, শান্ত সমুদ্রে সবাই নাবিক হতে পারে। কিন্তু ঝড়ের দুর্যোগে? একটু থেমে সে বললো, মিনুদি আমরা সেই ঝড়ে-উদ্দাম সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছি, দিকচিহ্ন একেবারে অস্পষ্ট, অথচ চারদিকে লোভনীয় অজস্র উপকরণ, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়, সে নারী বলো, মদ্য বলো, অথবা অন্য যা-কিছু। কিন্তু আমাদের পিতারা এসব জোগাড় করেছেন প্রভূত পরিশ্রমে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে; তার পরও তাঁরা ভোগ করেছেন। আর আমাদের চারিরিকে কি ভীষণ ছড়াছড়ি। উপকরণের তুলনায় তবু স্খলন কতো নগণ্য! অথচ ঋষি বিশ্বামিত্র একটি উর্বশীকে দেখে তপোভঙ্গ হয়েছিলেন, আর সহস্র সহস্র উর্বশী দেখেও আমরা এখনও পথ চলছি, ঘর করছি, বলা যায় তপস্যাও। আমাদের এ সংযমের মূল্য মিনুদি কেউই দিলো না।

পল্লবের ওই এক দোষ। সুযোগ পেলেই এক গাদা কথা বলবে। অবশ্য এতে আমার প্রশ্রয় ছিলো। শুভ, প্রশ্রয় না দিয়ে পারিনি, আমি যে ওর শুধু মিনু নয়, আমি যে ওর দিদি, মিনুদি। তবু পল্লব আমার জন্য কলঙ্কিত হলো। না, ওকে কলঙ্কিত করলো, এমনই ওর নিয়তি।

পল্লবের কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমি রায় দিতে পারি না। আমিও যে পল্লবের কালের। স্ব-কালের স্বপক্ষে কে না কথা বলে? পল্লব কিন্তু বয়স্কদের হাতে সেই বিচারের ভার ছেড়ে দিতে অরাজী। সে বলে, বৃদ্ধরা অন্ধ। ও'রা দেখেও দেখেন না। সে বলে, বরং আমরা অনেক বেশি নিরপেক্ষ; কারণ আমাদের বক্তব্য চিন্তাসহ, যুক্তিসহ এবং সত্য নির্ভর। ও'দের কিন্তু পিছুটান প্রবল। ও'রা ও'দের কালকে একেবারে বিয়ের কনে সাজিয়ে সভায় আনেন, রাখেন বেশ তফাতে, যাতে স্পর্শে কলঙ্কিত না হয়। এবং ওতেই ও'দের সুখ।

এসব এতো তাড়াহুড়ি আমি বুঝি নে। আমার সময় লাগে।

শুভ, এ সমাজের, সংসারের কিছুই তাড়াতাড়ি বোঝা যায় না। যেমন তুমি বোঝোনি, শিখা, সীমা, বর্ণাকে। যেমন বোঝোনি, অসীম, রুনু, পুলকদের। মালতী আর অমলাকে। এর জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, প্রতীক্ষা করতে হয়, তারপর দিনে দিনে স্পষ্ট হয়। তখন সহজে জানা যায়, বোঝাও। শুধু স্খলন-পতনের ইতিহাসই তো তাদের সব নয়। তাদের জীবন এ সবকে নিয়েও বটে, ছাড়িয়েও বটে। বরং যদি আগে আমাদের চোখ পড়তো উচ্ছৃঙ্খলতার উৎসে, যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করতাম কেন উচ্ছৃঙ্খল হয়, কেন মরবে জেনেও মরিয়া হয়ে ছোটে, শুভ, অন্ধকারে আলো পড়তো। কিন্তু আমরা যে তাৎক্ষণিককে নিয়ে ঘর করি, আমাদের মরণ সেখানেই।

অথচ, মানুষ কি উচ্ছৃঙ্খল একদিনে হয়? না শুভ, উচ্ছৃঙ্খল হয় দিনে দিনে। এর গোড়ায় কাজ করে তীব্র অভাববোধ। যা নয়, তা হবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। এবং এ-শহর সে অভাব-বোধকে আরও তীব্র, তীক্ষ্ণ করেছে, ইচ্ছেকে করেছে বহুমুখী। অথচ নিজের অসামার্থ্য, অক্ষমতার হাতে তারা নিদারুণ অসহায়। শুধু তাই নয়, উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে বিরাট সংখ্যক নারী-পুরুষের অপরিমিত অবকাশ। এ অবকাশের হাতে কারও রেহাই নেই। অন্যের কথা ছেড়ে দাও, আমি নিজেই কি এ অবকাশের শিকার নই?

এই অবকাশ তোমার পরিচিত। তোমার নিঃসঙ্গতার জনক এই অবকাশ। তোমার উর্ধ্বশ্বাস ছোটার, যন্ত্রণার, তোমার সমস্ত দুঃখের।

শুভ, আমি জানি এ মুহূর্তে বুদ্ধিমান কেউ প্রশ্ন ছুঁড়ে মারতে পারে। বলতে পারে, বুঝলাম সবই, কিন্তু এ যে মূর্তিমান অকল্যাণ। এতে যে সমূহ সর্বনাশ।

সর্বনাশ কি না জানি নে, তবে বলতে পারি কল্যাণ-অকল্যানের ধারণা একান্ত ভাবেই নিজস্ব। তোমার যাতে কল্যাণ, তাতে আমারও কল্যাণ হবে এমন কোনো কথা নেই। এখানে একটা ঘটনা বলি, তাহলে বুঝতে এবং বোঝাতে অনেক সহজ হবে।
আমি নবেন্দুর কথাই বলছি।

নবেন্দুর বোন ক্ষমা নবেন্দুর বন্ধু প্রিয়তোষকে ভালোবেসেছিলো। এ ভালোবাসা হয়েছিলো নবেন্দুর অজ্ঞাতে। ঘুণাক্ষরেও সে জানতে পারেনি। অথচ যখন জানতে পারলো তখন বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় সে থ। অবশ্য এটা ঠিক, প্রিয়তোষের বিয়ে করে বউ পোষার ক্ষমতা ছিলো না। সে তখন পার্টির সাহায্যে কোনো মতে চলে। তাছাড়া প্রিয়তোষরা পাল্টি ঘর নয়, তদুপরি প্রিয়তোষ যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত। অবশ্য রোগের কথা ক্ষমা জানতো না, নবেন্দু জানতো। যদিও প্রিয়তোষের রোগ তখনও মারাত্মক রকমের কিছু নয়, প্রাথমিক পর্যায়ের। তাই নবেন্দু যখন প্রিয়তোষকে অভিযুক্ত করলো, প্রিয়তোষ সহজেই জানালো এ ছাড়া তার উপায় ছিলো না। সংসারে যার আপন বলতে কেউ নেই সেই হতভাগ্যের, সেই কাঙালের পক্ষে এমন একজনের প্রয়োজন, যাতে মনে হবে সে নিঃস্ব নয়, রিক্ত নয়। এ সংসারে তার জন্যে ভাববার, তার কথা মনে করবার একজনও আছে। নইলে যে সে নিজে বাঁচে না, মরে। এবং সে বারবার মিনতি করে নবেন্দুকে বলেছে, শুধু তার মুখ চেয়ে, সে যেন ক্ষমা করে। কারণ সজ্ঞানে ক্ষমার কোনো ক্ষতিই সে করেনি।
এর পরের ঘটনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। সে তিক্ততা উহ্য থাক। কিন্তু নবেন্দুর ধারণা, প্রিয়তোষ তার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এতো বড় বিশ্বাসঘাতকতা করার সুযোগ পেয়েছে। ক্ষমাকে সে করুণা করলেও প্রিয়তোষকে কিছুতেই নয়, কারণ নবেন্দুদের পরিবারে সে একটা সর্বনাশ ঘটাতে যাচ্ছিলো। এবং তার বিশ্বাস, ধরা না পড়লে প্রিয়তোষ যে কোনো ক্ষতিই করতে পারতো।
শুভ, প্রিয়তোষের পক্ষে যা কল্যাণ, নবেন্দুর পক্ষে তা অকল্যাণ। নবেন্দুর ভাষায় ক্ষমার পক্ষেও। যদি বলো, এ তো ব্যক্তিগত কল্যাণের দিক, কিন্তু সামাজিক কল্যাণ? শুভ, ব্যক্তি বাঁচলেই তো সমাজ, নইলে সমাজই বা কি, রাষ্ট্রও বা কি? হয়তো বলবে বৃহৎ ক্ষতির কাছে ব্যক্তির লাভালাভ কি তুচ্ছ

নয় ? শুভ, আমাদের পালে বাঘ পড়েছে সেখানেই। আমরা যে বৃহৎবোধকে নিঃশেষে হারিয়ে বসে আছি, আমরা প্রত্যেকেই স্বার্থান্ধ। আমাদের সম্মুখে বড়ো কোনো আদর্শ নেই, থাকার কথাও নয়, কারণ আমরা তো প্রতিযোগী; যার জিৎ, বাজীমাত করছে সেই-ই। শুভ, এ সমাজে সামগ্রিক কল্যাণের প্রশ্ন অবান্তর, জানি নে আমরা কি করে জেনে ফেলেছি—সে মূর্খতা। ফলে আমরা নিজেকে দেখি, বিচারও করি নিজেকে দিয়ে। তুমি তোমাকে ছাড়াতে পারোনি, আমিও আমাকে নয়।

শুভ, আমরা ভয়ানক আত্মকেন্দ্রিক। কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রে, কিছুটা অর্জন করে আমরা এ গুণের অধিকারী হয়েছি। এ আমাদের দোষ নয়, এইই মানুষের যথার্থ স্বভাব। একে ছদ্মবেশ পরানো নিরর্থক! সেটা শাদা চোখেও ধরা পড়ে।

আমার গণ্ডী ছাড়িয়ে আমি অনেক দূরে চলে এসেছি। জানি না এ ভালো হলে কি না। পুরাণের নজীর যদি টানো তাহলে সন্দেহ নেই, ভালো করিনি। যে কোনো মুহূর্তে ছদ্মবেশী রাবণ স্ব-রূপে আমাকে গ্রাস করবে, করতে পারে। না শুভ, আমি আর বেশি দূরে যাবো না। বরং আমার আপন কথাগুলো বলে নিই, তাতে লাভ হবে এই যে, হারানো দিনের ভারমুক্ত হতে পারবো। হয়তো এ রকম সুযোগ ভবিষ্যতে আর পাবো না।

তুমিই তো বলেছো শুভ, এক রকমের সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার আসে না।

হয়তো তাই।

বিশ্বাস করো হঠাৎ আমাকে নিজের কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্যে আমি তোমার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটি কথা শুভ, যে চিঠি তুমি তোমার বন্ধুকে লিখেছো, সে চিঠি তুমি আমাকে পড়তে দিলে কেন ? কেন সে চিঠি তোমার বন্ধুকে না দিয়ে রেখে দিয়েছো ? কেন ? সত্যিই শুভ, তোমার স্বভাব আমার নাগালের বাইরে। আমি সঠিক বুঝিনে। তুমি কি আশা করেছিলে ?

কি ?

তোমার আশা তোমারই থাক শুভ, তাকে জানতে গিয়ে প্রত্যাবর্তনের দুঃখ আমি আর পেতে চাই না। সে হয় না। সবচেয়ে মজা কি জানো, জীবনের পথে শুধু মাত্র চলা যায়, যত দূর সম্ভব পথ পেরনো যায়, কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও ফেরা যায় না। যেটুকু ডিঙিয়ে এসেছো, সেটুকু চিরদিনের মতোই। তুমি হয়তো তেমনতর অন্য পথে চলতে পারো, কিন্তু একই পথে

কখনও নয়। কিছুতেই নয়।

শুভ, আমাদের সেই সুন্দর দিনগুলো এখন স্মৃতি হয়ে গেছে, তাদের পুনরুজ্জীবন অসম্ভব। অথচ কি দিনগুলোই না আমাদের ছিলো। দুজনে কি অপরিমিত মূল্যই না দিয়েছিলাম তার জন্যে। সে-দিনগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেলো। কতোদিন আমি তাদের মরিয়া হয়ে হাতড়ে ফিরেছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তেমনি স্পর্শসহ হয়ে তারা আর আমার নাগালে এলো না। কিছুতেই না।

সে-দিনগুলো কি নক্ষত্র হয়ে গেছে ?

এখন ভর দুপুর। আজ রাতে আমি ঠিক আকাশ দেখবো শুভ। যদি কৃষ্ণপক্ষের রাত হয় অনেক অনেক তারা জাগবে আকাশে। অনেক অনেক। আমি সেই এক আকাশ তারার ভিড়ে আমার চেনা নক্ষত্রগুলোকে জনে জনে শুধাবো, ওরা কি তারা ? আমার হারানো দিন ?

আমি ঠিক জানি, ওরা শুধুই তাকিয়ে থাকবে, জবাব দেবে না। ওরা জবাব দেয় না।

আমি আমার স্মৃতির ঝাঁপি খুলছি তুমি যাচাই করে দেখো আমি ঠিক বলছি কি না ? অথচ তুমি আমাদের মেলামেশার ঘটনাগুলোকে কি নিদারুণ ভাবেই না অতিরঞ্জিত করেছো। আমি জানি অতিরঞ্জন তোমার স্বভাব। শুধু তাই নয় প্রতিটি ঘটনাতেই তুমি তোমার নিজের দুর্বলতাকে কৌশলে আড়াল করেছো, এবং তোমার দুর্বলতাগুলোকে স্বচ্ছন্দে চাপিয়ে দিয়েছো আমার ঘাড়ে। আমার ওপর তোমার এত রাগ আমি জানতাম না। যাকগে সে সব তুচ্ছতার প্রতিবাদ আমি করবো না, সে তোমার এলাকা। আর প্রতিবাদ করেও বা লাভ কি ? আমি যা, আমি তাই-ই। তোমার চোখে না হয় আমি তোমার কল্পিত ঋতু হয়েই থাকবো। এবং এখন যা বলবো, তা বলছি আমার দিক থেকে শুধু পার্থক্যটা দেখানোর জন্যে, তোমার আমার দুজনেরই। সে পার্থক্য ইচ্ছার, অনুভবের, এবং গভীরতার। আচ্ছা শুভ, তুমি আমার ব্যবহারে যতো মাংসলতার আরোপ করেছো, হলপ করে বলো তো, আমার ব্যবহার কি ততো মাংসল ? না, ও সব থাক। আমি নিজের কথাই বলি।

আজ মিথ্যে বলে লাভ নেই, কি হবে ছলনায় ? তুমি আমি কিছুতেই আর

সেখানে ফিরতে পারবো না, ফিরে কাজও নেই। তাই বলছি, নির্দ্বিধায় বলছি, তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। আমার জীবনে তুমিই বোধহয় দ্বিতীয় জন, যার ভালোবাসা পাবার জন্যে আমি অনেকটুকু মূল্য দিয়েছিলাম। এবং সেই ভালোবাসার আশ্চর্য প্রদীপ আমি নিবাইনি। নিবিয়েছো তুমি, তোমার অহংকার, তোমার লোভ, তোমার অস্থিরতা, তোমার লুণ্ঠনপটু কুৎসিত মনোবৃত্তি।

শুভ, ভালোবাসা এক রকমের নয়, সে বহুরূপী। প্রসাদ আমার কাছ থেকে যা পেয়েছে, পাচ্ছে, তা তুমি পাওনি; তুমি যা পেয়েছিলে প্রসাদ তার ছিটে-ফোঁটাই পেয়েছে। মা ছেলেকে যেমন ভালোবাসে, প্রেমিক প্রেমিককে কি তেমনই ভালোবাসে? অথবা স্ত্রী স্বামীকে? ভাই বোনকে? বন্ধু বন্ধুকে? তাও বা কেন এ সংসারের কতো কিছুকেই তো আমরা ভালোবাসি। গয়না, আসবাব, ঘর, গাছ, ফুল, পাখি, চাঁদ, সমুদ্র সব ভালোবাসা কি এক-ই জাতের? না শুভ, মা'র ছেলেকে ভালোবাসা তাকে আমরা আলাদা করে বলি, স্নেহ। ভাই-বোনের ভালোবাসাকে মমতা, প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসাকে প্রেম, বন্ধুর ভালোবাসাকে বন্ধুত্ব। আর স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা শুভ, স্নেহ, প্রীতি, মমতা, প্রেম, বন্ধুত্ব এ সব নিয়ে। তার সুখের দিনে আমি সখী, দুঃখে সমব্যথী। তার ব্যর্থতায় আমি উৎসাহদাত্রী, তার জয়ে আমি গরবিনী, তার কর্মে আমিই প্রেরণা। শুভ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বড্ড জটিল, তোমার সেই সহস্রচক্র ব্যূহের মতো। তার অজস্র কেন্দ্র-বিন্দু, অজস্র জটিলতা। সে-ভালোবাসা পাবার জন্যে তপস্যা করতে হয়। তার জন্যে কতো উদ্‌যোগ, কতো আয়োজন, হৈ চৈ। কতো আচার, কতো অনুষ্ঠান। শুভ, সে তো শুধু মালাবদল নয়, সপ্তপদ গমনও। না, তারও বেশি। তার জন্যে যাগ-যজ্ঞ-হোমের সে কি ইলাহী ব্যবস্থা। কতো বাজনা, কতো কোলাহল, কতো নিয়ম, নীতি। শুভ, বিবাহ হচ্ছে বিশেষরূপে বহন। এবং সে প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ হলেই স্বামী-স্ত্রী, তার আগে নয়, কিছুতেই নয়। তুমি মূর্খের মতো আমার কাছে সে-ভালোবাসা প্রার্থনা করেছিলে, তুমিই বলো, আমি তা পূরণ করতে পারি? যদি পূরণ করতাম তার ফলের ভার কে বহন করতো শুভ? তুমি নিশ্চয়ই নয়? কিন্তু প্রসাদ কেন শুধু শুধু উপরি ভার বহন করবে? কেন? এ সংস্কারের কথা নয়, এ ন্যায়ের কথা। শুভ আমরা তো শুধু সই করে বিয়ে করিনি। যদি করতাম তা হলেও তোমার সব দাবি মেটানোর প্রশ্ন উঠতো না,

সেখানেও যে বিশ্বস্ততা রক্ষার অলিখিত প্রতিশ্রুতি ছিলো। যতক্ষণ ছাড়াছাড়ি না হচ্ছে ততক্ষণ আমাকে স্থির থাকতেই হবে, নইলে যে ন্যায় বাঁচে না। আর অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে আমি ন্যায় দাবি করবো কোন সুবাদে?
তুমি আমার কাছে অন্যায় দাবি করেছিলে। আমি তোমাকে একশো বার ভালোবাসতে পারি, কিন্তু ভালোবাসলেই আমার সর্বস্ব দিতে হবে তার কি মানে আছে? অথচ সবটুকু না পেলে তোমাদের ভালোবাসা সম্পূর্ণ হয় না। শুভ, সবটুকু পেতে হলে বিশেষরূপে বহনের দায়িত্বও স্বীকার করতে হয়। সেটুকু ছাড়া সবটুকু পাওয়া যায় না শুধুই স্পর্শ পাওয়া যায়।
শুভ, ভার বইতে শেখো।

এই দেখো, কোথা থেকে শুরু করলাম। না করে উপায় কি? সেই দিনগুলো শুধু নয়, তার রঙও যে হারিয়ে গেছে। এখন স্মৃতিতে আছে দিনগুলোর বিচ্ছিন্ন অনুভব, কিছু প্রশ্ন, এবং দু-একটি অবিস্মরণীয় ছবি। সেগুলো এখন স্পষ্ট করি। তাতে সুবিধে এই যে দুজনে দুজনকে দেখতে পাবো।
শুভ, এ-সংসারে মুখোমুখী দাঁড়ানোর সুবিধে অনেক।

পোর্টের ওপরে ঝুলে থাকা সেই হলুদ রঙের আশ্চর্য বিকেলের কথা তোমার মনে আছে শুভ, আমি যেদিন তোমার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে, লজ্জা-সংকোচ ত্যাগ করে প্রথম তোমাকে গান শুনিয়েছিলাম? মনে আছে?
আমি কিন্তু স্পষ্ট মনে করতে পারি সব। সেদিনের ট্যাক্সিতে করে অনেকটুকু ঘোরা, অনেক গলি-গুঁজি, অনেক মানুষ, ঘর-বাড়ি ছাড়িয়ে হঠাৎ থেমে যাওয়া। তারপর মৃদু মৃদু পায়ে নরম ঘাসের ওপর দিয়ে অনেক দূর হাঁটার পর খাদের ধারে তোমার আমার পা গুটিয়ে বসা, অনেক কথা অনর্গল বলা; সব, সবই আমার মনে আছে শুভ। কিছুই ভুলিনি।
ক্রমে বিকেল ভাঙছে। অনেকগুলো পাখি, রাশ রাশ শব্দ আর অসংখ্য মানুষ ক্রমে ক্রমে আমাদের মাথার উপর দিয়ে, কানের ধার দিয়ে, দেখতে দেখতে পার হয়ে মিলিয়ে গেলো। তুমি ঘাসে, ঘাসের ফুলে, হাত রেখে বলেছিলে, একটা গান গাইবে ঋতু?
গান গাইবার মতো বিকেলই বটে। তবু সংকোচে লজ্জায় দ্বিধায় আমি বলেছিলাম, আমি তো জানি নে।

না-জানা গানই গাও।

বা, না-জানা গান আবার গাওয়া যায় নাকি?

খুব যায়। তুমি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করেছিলে, গাইবে না? এবং ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিলে, বেশ, গেয়ো না।

গাইতে জানলে তো?

তুমি হঠাৎ বলেছিলে, যদি আর কোনোদিন অনুরোধ করি তো।

তোমার মুখের কথা টেনে নিয়ে বলেছিলাম, কিন্তু হাসতে পারবে না।

আমার কথায় তুমি হেসেছিলে। আমি তো জানতাম তোমার স্বভাব, নিশ্চয়ই কোনো হলপ করে বসতে হঠাৎ, তাই বাধ্য হলাম গান গাইতে।

আচ্ছা, সেদিন কি গান গেয়েছিলাম শুভ?

জানি এটা তোমার মনে আছে। কেন আছে বলো তো? এবং বলো দেখি কেন ও-গানটাই গেয়েছিলাম?

শুভ, ও যে আমার কথা। আমি জানতাম -

'…আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।'

শুভ আমি জানতাম। আর জানতাম বলেই নিজেকে বিলিয়ে আমার অফুরন্ত অবকাশকে হারাতাম। তোমাদের কাছে বেশি দাবি আমি কোনোদিনই করিনি, শুধু প্রার্থনা করেছিলাম সঙ্গ; আর তোমরা, তার জন্যে অনেক অনেক বেশি আমার কাছে দাবি করেছো। দ্বিধা পায়ে পায়ে বেড়ির মতো বাজতো, আমি অসহ ধিক্কারে, গঞ্জনায় নিজেকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করতাম, উদ্বেগ মৃদঙ্গের মতো বোল তুলতো মনে, ভয় হতো। কতোবার মনে হয়েছে ক্ষণতরে আমি যদি মেতে উঠি তোমাদের খেলায়, যদি লাগাম হাতছাড়া হয়ে যায় আমার, ফিরতে পারবো তো? সেই সংশয়ের সেতু পার হতে পারিনি, কিছুতেই পারিনি। তাই তোমার ভাষায় শুভ, ঘুষ দিতাম। নইলে অবকাশ আমাকে কাঁদাতো, আমি মরতাম। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমার ধূপ তোমাদের আগুনে ছড়াতাম, আমার দীপ তোমাদের আগুনে জ্বালিয়ে নিতাম, যদি গন্ধ দেয়, যদি আলো পাই।

তোমরা সে-গন্ধে, সে-আলোতে খুশি হতে না, আমি বুঝতাম। তোমরা খাণ্ডব-দহনের ইচ্ছে পোষণ করতে মনে। কিন্তু শুভ, সেই দিগন্তগ্রাসী লেলিহান শিখায় আমিও যে ভস্ম হয়ে যেতাম। কে উচ্চারণ করতো স্বস্তি, শান্তি ? কে সে-আগুন নেবাতো ?

শুভ, আমি জানি, তালভঙ্গ হলে এ সংসারে কেউই মার্জনা করে না। তোমরাও না। তোমাদের মার্জনা পাইনি। তোমরা নির্দ্বিধায় আমাকে কলঙ্কিত করেছো। আমি অবাক হইনি।

নিজেকে বঞ্চিতের দলে কেউই ঠেলে দেয় না শুভ। সেই লজ্জাকে আড়াল করার জন্যে প্রতিপক্ষকে কলঙ্কিত করা খুবই স্বাভাবিক। আমি তোমাদের দেয়া কলঙ্কে বিব্রত হয়েছি সত্য, কিন্তু বার বার আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তোমাদের দীনতা, যা অহঙ্কার দিয়েও তোমরা ঢাকতে পারোনি। কিছুতেই পারোনি।

তোমার ঘরের সেই শব্দহীন স্তব্ধ দুপুরটার কথা মনে করো, যে দুপুর আমার উপস্থিতিতে বার বার নড়ে চড়ে স্থির হতে চেষ্টা করেছিলো।

তোমার মনে নেই ? উঃ এই আশ্চর্য বিস্মৃতি নিয়ে তুমি কি করে বেঁচে আছো শুভ ? অথচ সে-দুপুর আমার স্মরণে অবিস্মরণীয়। সেই দুপুরেই তুমি কী ভয়ানক ভাবে ধরা পড়ে গেলে আমার কাছে, আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। আকাশস্পর্শী স্পর্ধার আড়ালে তুমি এতো কাঙাল, এতো দরিদ্র কে জানতো ? আমি সেদিনই ভয় পেলাম। ক্রমে পিছিয়ে পিছিয়ে হারিয়ে যেতে চাইলাম তোমার স্মৃতি থেকে। এ ছাড়া উপায় ছিলো না শুভ। নইলে আমি যে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তাম, মেতে উঠতাম তোমার ইচ্ছের খেলায়। তাতে আমার সমূহ সর্বনাশ হতো। ঈশ্বর আমাকে ভয়ানক এক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো কোন দুপুরের কথা আমি তোমাকে বলছি। সেদিন লাল শাড়িটা আমি ইচ্ছে করেই পরেছিলাম। রোদ্দুরের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে। পাল্লা আমি ঠিকই দিয়েছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম যখন পথের 'পরে স্তরে স্তরে সাজানো রোদ্দুরের রেণুগুলো আমার শাড়ির গায়ে লেপটে যেতে গিয়ে বার বার ছিটকে যাচ্ছিলো, বার বার হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে স্থির হবার চেষ্টা করছিলো। ভীষণ ভালো

লাগছিলো আমার। আরও ভালো লাগলো, যখন তুমি সুবোধ ছেলেটির মতো বসে থেকে ঘরের শব্দহীন স্তব্দতাকে আরও গভীর, আরও নিবিড় করে তুলেছো। আমি স্তব্ধতাকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলাম, নির্জনতা অস্থির হলো।

আমাদের আড়াই বছরের দীর্ঘ ভালোবাসায় সেই-ই প্রথম দিন, যেদিন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি খেয়েছো ?

তুমি জবাব দিলে না।

কি, খাওনি কেন ?

তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলে। আমি জানতাম তখন তোমার কোনো চাকর নেই, সব কিছু তোমাকেই করে নিতে হয়।

আমি বললাম, আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাবো। তুমি উঠতে যাচ্ছিলে, আমি বাধা দিলাম। বাধা দিয়েই এগিয়ে গেলাম।

তুমি ছুটে এসে হাত ধরলে। বললে, দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি।

না, আমি নিয়ে খাবো।

বা, তা কেন, রোজই তো আমি দিই।

সেজন্যেই আজ আমি নেবো।

বেশ।

তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে। আমি তোমার রান্নাঘরে ঢুকলাম। জল খাওয়া আর আমার হলো না। আমি তোমার রান্নাঘরের অবস্থা দেখে হতবাক। এ কী ! চারিদিকে সে কি বিশৃংখলা। ভাত, তরকারী সব খোলা পড়ে আছে। থালা-বাসন ঘরময় ছড়ানো-ছিটনো। জলে থৈথৈ ঘর, এঁটোগুলো পর্যন্ত এলোমেলো। আমি সন্তর্পণে পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকলাম। উঃ কি বিশ্রী তোমার তরকারীর রঙ! এই খেয়েছো তুমি ? কি করে খেলে ? বমি এলো না ? আমি হাতা দিয়ে একটু ঝোল হাতে নিয়ে মুখে দিলাম। বিশ্রী, বিশ্রী। আমি ছিটকে বেরিয়ে এলাম।

শুভ, আমার কতোদিন মনে হয়েছে আমি জিজ্ঞেস করবো, তুমি কি দিয়ে খেলে, কি রান্না হয়েছিলো ? কতোদিন ভেবেছি জিজ্ঞেস করবো, দিনে দিনে এমন শুকিয়ে যাচ্ছো কেন ? তোমার তো কোনো অভাব নেই, তবু কেন শরীরের দিকে নজর রাখছো না ? আমি পারিনি। ভয় ছিলো যদি তাতে আমি ধরা পড়ে যাই, যদি তুমি বুঝতে পারো আমার দুর্বলতা, আমাকে

জড়িয়ে ফেলবে মুহূর্তেই কিন্তু সেদিন আর পারলাম না। বললাম, এসব কি হচ্ছে ?

তুমি আমার চোখে চোখ রেখেই বললে, কেন ?

আমি চোখ নামিয়ে বলেছিলাম, এসব তুমি করতে পারবে না।

তুমি হঠাৎ হেসে উঠলে। বললে, বেশ করবো না, কিন্তু এখন সে সব কথা থাক, এসো গল্প করি। তুমি আমার হাত ধরলে।

না, আগে একথাই হবে।

আজ তুমি বড্ড বাজে বকছো ঋতু। কই, এতোদিন তো, এ রকম কথা কখনও বলোনি।

বা, এতোদিন বলিনি বলে আজও বলবো না !

না। তুমি আমাকে টেনে তোমার বিছানায় নিয়ে গেলে। বললে, দেখো ঋতু, এসেছো ঘন্টা কয়েকের জন্য সময় কাটাতে, তাই-ই করতে দাও, এসব ভাবনা এখন না ভাবলেও চলবে।

আমি তোমার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কোনো জবাব দিলাম না।

আমার ভীষণ লজ্জা হচ্ছিলো শুভ, সঙ্কোচে আমি তলিয়ে যাচ্ছিলাম। অথচ ভেতরে ভেতরে ভয়। উঃ কি স্বার্থপরের মতো ব্যবহারই না আমি করেছি। বুঝতে পারছিলাম, এ কথাগুলো তুমি আরও আগে শুনতে চেয়েছো। শুভ, বাধা ছিল, ভয়। কিন্তু আর পারলাম না, আমার কান্না পাচ্ছিলো। বললাম, আগে জিজ্ঞেস করলে কি হতো ? আজ করেও কি হলো ? আমি তোমার একটি হাত নাড়তে নাড়তে বললাম, তুমি যদি পাশাপাশি থাকতে আমি রেঁধে খাওয়াতাম। সে উপায়ও যে রাখোনি। আমি চোখ তুলে চোখ নামিয়ে বললাম, তুমি একটি বিয়ে করো শুভ। এভাবে থাকা কিছুতেই চলবে না। আমি দেবো না।

তুমি আমায় জড়িয়ে ধরলে। বললে, ঋতু, এ তুমি কি বলছো ?

ঠিকই বলছি শুভ, এ ভাবে চলবে না।

কেন চলবে না ? কেন তুমি আড়াল ঠেলে ভেতরে গেলে ঋতু ? কেন ?

আজ দুপুরে সেজন্যেই তো এসেছি, নইলে তুমি আমাকে কোনোদিন দুপুরে আসতে দেখেছো ?

তুমি আমাকে আরও আঁকড়ে ধরলে। বললে, কেন এ-কথাগুলো এমন করে বলছো ঋতু, কেন এতোদিন এমনি করে একটিবারও বলোনি। উঃ ঋতু, ঋতু

তুমি চুপ করো, থামো। আমি—

তোমার কথাগুলো জড়িয়ে গেলো। তুমি কাঁদছো।

শুভ, তোমার দিগন্তস্পর্শী হাহাকার আমি তখনই স্পর্শ করেছি। বুঝতে পারছিলাম, অহঙ্কারী তুমি হারিয়ে গেছো, তোমার ভেতরের কাঙালটা কাঁদছে, ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আমি জানতাম, কিন্তু এতোটা নয়। সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তুমি এক জায়গায় ভীষণ দরিদ্র, একথা কতোদিন আমার মনে হয়েছে। তাই দেখতাম তুমি একটুতে খুশি নও, জড়িয়ে জড়িয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধতে পারাতেই তোমার আনন্দ। তুমি ধরা পড়লে।

সেই তোমাকে আমি অনেক অনেক দিন মনে রাখবো শুভ। আমরণ। এবং সেই তোমাকে চিনি বলেই তোমার অত বড়ো চিঠিটা পড়ে বিব্রত হয়েছি, কিন্তু ক্ষুব্ধ নই। আমাকে নিয়ে যে চিঠি লিখেছে সে সেই-দুপুরে কাঁদেনি। যে কেঁদেছিলো, সে কাউকে চিঠি লেখে না, লেখেনি।

সেই দুপুর আমাকে সচেতন করলো। আমি কথা দিয়েছিলাম পরের দিন যাবো, যাইনি। তার পরদিন তুমি রেগে-মেগে আমার কাছে ছুটে এলে। আমি তখন একেবারে মন স্থির করে ফেলেছি। তুমি তীব্র ভাষায় আমাকে আক্রমণ করলে। তোমার অসহ উত্তাপের আঁচ আমার গায়ে লাগছিলো। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার নীরবতা তোমাকে আরও উন্মত্ত করবে। তখন তুমি যা খুশি করতে পারো। আমি জানতাম। তবু নীরবতার ছদ্মবেশ আমি ছাড়তে পারলাম না।

তুমি বললে, আমাকে এ ভাবে নাচাবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে ঋতু? তুমি কি ভেবেছো? তুমি নাচাবে, আর আমি নিরবধিকাল নাচবো?

আমি জানি, আমি তোমাকে তখন কিছুতেই বোঝাতে পারতাম না। তুমি বুঝতে না। আমি বললাম, কেন অবুঝের মতো কথা বলছো, উপায় থাকলে আমি নিশ্চয়ই যেতাম।

কেন, উপায় নেই কেন? এতোদিন তো ছিলো।

যখন ছিলো তখন তো গিয়েছি। এখন আর যাওয়া সম্ভব নয়। পরে একদিন নিশ্চয়ই যাবো।

কি?

আমি চমকে মুখ তুললাম। কি আশ্চর্য! তুমি অমন বিশ্রীভাবে চেঁচাচ্ছো কেন? লোকে কি ভাববে?

ও, লোকের ভাবনার কথা তাহলে তুমিও ভাবো ?

আমি আর তোমার দিকে তাকাতে পারলাম না। মাথা নিচু করে বসেই রইলাম। প্রতীক্ষা করছিলাম আরও প্রচণ্ড বিস্ফোরণের। না, তা হলো না। হলে আমি অপ্রস্তুত হতাম না শুভ, মেনে নিতাম। তুমি চলে গেলে।

এ ছাড়া আমার আর উপায় ছিলো না শুভ। তুমি বিশ্বাস করো, সেই দুপুরের পর আমি কিছুতেই তোমার কাছে যেতে পারি না। আমারও তো মন আছে, মমতা আছে, প্রেম-প্রীতি-সহানুভূতি আছে। শুভ, আমি তো নির্মম কেউ নই। তার আগেই তো বলেছি, আমার ইচ্ছের মধ্যে মাংসলতা প্রচুর, তার সবটা শুদ্ধ নয়। আমি যদি যেতাম আমি বাঁধা পড়তাম। তোমার ইচ্ছেগুলো আমার ইচ্ছেকে শরীরী করতো। তখন ঝাঁপ না দিয়ে পারতাম না।

তাতে আমাদের মরণ হতো।

শুভ, আমি মৃত্যু চাই না।

যদি আমার দৈন্যের খবর তুমি জানতে, যদি জানতে তোমাকে ফিরিয়ে দেবার দুঃখ কতো অপরিমিত, কতো অসহনীয়, শুভ, তুমি আমাকে সহজেই ক্ষমা করতে। আমি কতো কেঁদেছি। কতো দিন, কতো রাত। কতোবার মনে হয়েছে যাই; ছুটে গিয়ে শুধু ভালো থাকার খবরটুকু নিজে গিয়ে নিয়ে আসি। পারিনি। কিছুতেই পারিনি।

নিজের কানে তোমার সুখবর শোনা আর হয়নি, কিন্তু অনেকের মুখ থেকে টুকিটাকি খবর আমি পেয়েছি। কতো দিন বিরলে বসে চোখের জলে তোমার খবরগুলোকে পর পর সাজিয়ে আমি তোমাকে ভেবেছি, তুমি সে কথা জানো না শুভ। সেই না-জানাতে ভালোই হয়েছে। তুমি আমাকে ঘৃণা করতে শিখেছো। ঘৃণা তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সমস্ত রকমের ভালোবাসার হাত থেকে ঘৃণাই আমাদের বাঁচায়। নইলে স্পর্শসহ মৃত্যুকে কিছুতেই ঠেকানো যায় না।

শুভ, আমার কথা ফুরিয়ে এলো। তোমাকে আর কিই বা আমি জানাতে পারি ? তাছাড়া সব কথা আমিই কি জানি। তোমাকে জানানোর যা ছিলো তা স্মৃতির উপর নির্ভর করে, অভিজ্ঞতার রঙে রাঙিয়ে সাজিয়ে দিলাম। তুমি বুঝে নিও। তবে একটি কথা আবার বলি, জীবনে আর যাই-ই চাও, সব পেতে

চেও না। সব পাওয়া সুখের হয় না। তাছাড়া সব কি পাওয়া যায়?
তুমি সব বলতে কি বোঝো বলো তো? কি? অথচ তুমি নাকি আমার সবই চেয়েছিলে? সব পেলে কি হতো শুভ?
কিছুই হতো না। আমি জানি, যে ক্ষুধার তীব্রতায় তুমি সব পাওয়ার কাঙাল হয়েছিলে, সে ক্ষুধা যদি মিটতো তাহলে তুমি তেমনি তীব্রতায় ছিটকে তফাতে সরে যেতে, যেমন আজ সরে গেছো। মনে হতো বিরক্তিকর, যেমন আমার মনে হয়। অথচ আমার এই পোড়া দেহের প্রতি তোমার ভীষণ লোভ ছিলো। শুভ, ঐটুকু পর্যন্তই ভালো, তার বেশি হলেই যন্ত্রণা। তাতে স্বস্তি নেই, শান্তিও না। আগেই তো বলেছি শুভ, 'দেহ সোজা সড়কের মতো সহজ, পরিচিত পরিবেশের মতো বৈচিত্র্যহীন। এ অভিজ্ঞকে সহজে ক্লান্ত করে, অনভিজ্ঞকে কোনো সান্তনা দেয় না।' তবু তা তোমার চাই। শুভ, তোমার এ চাওয়াটাই বিশ্রী? এ বিকার, এ পাশবিক। এখানেই তুমি দীন, তুমি নিতান্ত দরিদ্র। অথচ তোমাকে আমি কি দিইনি! ভেবে দেখো, এ সংসারে কে কার জন্যে অপরিসীম দুঃখ সহ্য করে, দুঃসহ ব্যথা? কে চোখের জলে স্মৃতিচারণ করে? আজ আমি বুঝতে পারি, আজ পর্যন্ত কেউই আমাকে ভালোবাসেনি, বেসেছে আমার দেহটাকে। এ হলো ভগবানকে উহ্য রেখে বিগ্রহকে পুজো করার মতো, এতে আয়োজন আছে, ভক্তি নেই। শুভ, এ সত্যকে জানার জন্যে আমাকে অনেক ঘৃণা আর অজস্র কলঙ্ক মাথা পেতে নিতে হয়েছে। আমি বুঝি, তোমাদের কাঙালপনা। তোমাদের ভালোবাসাবাসির খেলা আমাকে কোথায় ছুঁড়ে দিয়েছে? কেন আজ আমি ফিরতে চেয়েও ফিরতে পারি না। মরীয়া হয়ে ছুটি। এবং সেই যন্ত্রণার ঘোলাজলে মুখ ডুবিয়ে সারাক্ষণ মগ্ন হয়ে থাকি।

তুমি ঋতুকে ভুল বুঝেছো। আসলে ঋতু জানতো কাকে ভালোবাসা বলে, কি করে ভালোবাসতে হয়। তোমার দেখার ত্রুটির জন্যে তুমি তাকে দেখোনি। তুমি যাকে দেখেছো, সে আসল ঋতু নয়, সে তোমার কল্পিত একজন, যাকে তুমি তোমার অন্যায় কামনার আভরণে সাজিয়েছিলে।
আমি জানি, আজও তোমার কল্পিত ঋতু তোমার স্মৃতিতে বেঁচে আছে, কিন্তু শুভ, আসল ঋতু মরে গেছে। কবে, কখন, কি ভাবে মরেছে আমিও জানতাম না, যখন টের পেলাম তখন সে, সেই তোমার দেয়া নামে গর্বিতা ঋতু হারিয়ে গেছে, একেবারেই হারিয়ে গেছে। আমি তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু

শুভ, কিছুতেই তার আর নাগাল পাইনি। কোথাও সে ছিলো না।
যে একবার মরে. তাকে কি আবার পাওয়া যায় ? আমি জানি না।

শুভ, যার নাম ছিলো মৃন্ময়ী, যে পরে মিনু, ময়ী, ঋতু হয়েছিলো, এবং ঋতু নয়, ঋতুর মতো যে তোমাকে চিঠি লিখছে, তাদের সবারই কথা শেষ হলো। এখন আরেকজনকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি, যে মোটেই সুতপা নয়, সুব্রতা নয়, কল্যাণীও না। তার নাম রাখো মত্তা। এ মৃন্ময়ী, মিনু, ময়ী, ঋতু, অথবা ঋতুর মতো কেউ নয়, এ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ অন্য আরেকজন। এ জানে না, কেন তার দিন দুঃসহ, রাত্রি নিদারুণ বিরক্তিকর। এ জানে না, কে তাকে এমন তীব্র ভাবে বাইরে টানে, কে ঘরকে পেছনে রেখে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে নিরন্তর প্রলুব্ধ করে ? সে জানে না। তবু সে ছোটে কুকুরের তাড়া খাওয়া অন্ধের মতো, উন্মত্তের মতো। স্বামী তাকে বাঁধতে পারে না, ছেলে না, মেয়ে না। কোনো নীতি, নিয়ম, সংস্কার, এমন কি সচেতনতাও না।
শুভ, একে তুমি চেনো না, চিনতে পারো না। অথচ তোমাদের ভালোবাসা-বাসির খেলা এর জন্মের জন্যে দায়ী।
না, তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, থাকলেও করবো না। কি লাভ তোমাদের কলঙ্কিত করে ? যে কলঙ্ক আমি বইছি, যে ঘৃণা আমাকে দিগভ্রষ্ট করেছে, সে তোমাদের সাজে না। তোমরা নিষ্পাপ দূরত্ব থেকে আমাকে দেখে যাও, আমি কথা দিচ্ছি, আমার ছায়া তোমাদের আর কোনো দিন স্পর্শ করবে না, আমি করতে দেবো না।
তোমরা তো নিষ্পাপ দূরত্বে থাকতেই ভালোবাসো, না শুভ ?

এখানেই মনুর মার কথা বলি। মনুর মাকে তুমি বহুবার দেখেছো। সে দীর্ঘদিন আমাদের ঝিয়ের কাজ করেছে। আসলে মনুর মা জাত ঝি নয়, মনুর মার বুড়ো বয়সের শ্রী-ই তার প্রমাণ। তার মেয়েকে যদি তুমি দেখতে শুভ, তুমি কেন, তোমাদের সমবয়সী যে-কেউই দেখতো, আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি তাকে পাবার জন্যে যে-কোন মূল্য তোমরা নির্দ্বিধায় ধরে দিতে। সে কিন্তু তার দাম ধরে রাখতে পারেনি। এখন তাকে স্বল্প মূল্যে অনেকেই কেনে।
অথচ মনুর মা এককালে রায় পরিবারের বড়ো বউ ছিলো। এ রায়েরা রাস্তার রায় নয়, এ শহরের অন্যতম বনেদী রায় পরিবার। সে ঘরের বউ ঝি-গিরি করছে।

বড়ো রায়ের এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে বড়ো, ছেলে ছোটো। যখন ছেলেমেয়ে নিয়ে বড়ো বউ রাস্তায় ছিটকে পড়লো তখন রায় গত। বড়ো বউ প্রাসাদ থেকে হেঁটে সোজা বস্তিতে চলে গেলো। কোনো সঙ্কোচ তার চলাকে দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারেনি। বড়ো বউ জানতো না বস্তিতেও দুমুঠো খাবার এমনি মেলে না, তার জন্যে প্রচুর মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। বড়ো বউ ক্রমে মনুর মা হয়ে গেলো। তবু অভাব, অভাব। ছেলে অসুখে পড়লো। অভাব আরও তীব্র হলো।

এর পরের কাহিনী মনুর মার নয়, মনুর মার মেয়ে বিমলার। বিমলা ক্রমে বিমলি হয়ে গেলো। শুভ, শুধু বিমলির কথা আমি বলছি না, আমি বিমলার বিমলি হবার কথাই বলছি।

পথে নামতেই অন্ধকার। বিমলা সে অন্ধকার ঠেললো, কিন্তু সরলো না। অনন্যোপায় সে। প্রচুর দ্বিধা, অজস্র দ্বন্দ্ব। পায়ে কি যেন কাঁটার মতো প্রতিক্ষণে বিঁধছে, তবুও। কারণ পথ এক এবং অদ্বিতীয়। অগত্যা এক রাশ অন্ধকার তাকে খেলো। সে কি বিরক্তি, সে কি গা ঘিনঘিনে কুশ্রীতা! একমুখ ঘৃণা নিয়েই ফিরলো সে। না সে আর যাবে না, কিছুতেই না। কিন্তু আবার তাকে যেতে হলো। ছোটো ভাই যে মৃত্যুশয্যায়।

বিমলা হিসেব করলো, তারপর পা ফেললো গুনে গুনে। সে নিশ্চয়ই ফিরবে। ফিরে সে আসবেই। ফিরেও ছিলো। কিন্তু ততোদিন বিমলাকে নেশায় ধরেছে। তার মনে হয় ঘর, ঘরের পরিসর ভীষণ একঘেয়ে, বিরক্তিকর। তাছাড়া বস্তি হলেও এখানে আলোর তেমন অভাব কৈ? এতো আলো বিমলার অসহ্য। এ তার চোখে সয় না। তার সইবে না। বিমলা আরও অন্ধকারের জন্যে উন্মুখ হলো। তার অন্ধকার চাই, আরও অন্ধকার। আরও রাশি রাশি অন্ধকার। বিমলা দ্রুত বিমলি হয়ে গেলো।

শুভ, আমাকেও নেশায় ধরেছে। আমিও মজেছি। কিন্তু সে কিসে?

মদ খেলে নেশা হয় শুনেছি। কিন্তু সে কেমনতর নেশা আমি জানি নে, আমি পরখ করে দেখিনি। শুনেছি, সব ভুলিয়ে দেয়। কি ভোলায়? আর যে নেশা ভোলায়, সে কি নেশা? না শুভ, আমি যাতে নেশাগ্রস্ত হয়েছি, এ ভোলায় না, অবশও করে না। এ তীব্র থেকে তীব্রতর উত্তেজনায় দ্রুত ছুঁড়ে দেয়। তখন আকাশ, মাটি, হাওয়া একই মুহূর্তে তোলপাড়। তখন মুহুর্মুহু রঙ বদল হয় ইচ্ছার। সে কি নিদারুণ অনিশ্চিতি, উৎকণ্ঠা, ভয়, উদ্বেগ, আর

অস্থিরতা। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝিবা পায়ের নিচের পৃথিবী দিগন্ত বধির করা চীৎকারে ফেটে চৌচির হয়ে গেলো, সর্বগ্রাসী ঝড়-ঝঞ্ঝায় বুঝিবা আমি চ্যুতপত্রের মতো লীন হয়ে গেলাম বিসারিত শূন্যে। মনে হয় এই অস্তিত্ব লগ্ন বদলের অপেক্ষা না করেই হারিয়ে গেলো চিরদিনের মতো। তখন শুভ, কী ভয়ানক সুখ, কী দুর্মর যন্ত্রনা। তখন সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো যেন ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে যেতে চায়, হৃদয়ের স্পন্দন তখন সহস্র কণ্ঠে বোল তোলে জলদে, মনে হয় সারা দেহ-মন জুড়ে লক্ষ লক্ষ দুন্দুভির শব্দ উন্মাদ হয়ে ফেটে-ফুটে মুহূর্তে দিক্‌বিদিকে ছিটকে পড়ছে। শুভ, ভীষণ ভালো লাগে। মনে হয়, বেঁচে আছি। আমার বেঁচে থাকা তখন সত্যিই স্পর্শসহ। আমি বিমল আনন্দে, আতঙ্কে, তাকে ছুঁই। তখন আমার অস্তিত্ব যেন এক একস্রোতা নদী, যে সারাক্ষণ কুলু কুলু শব্দে অবিরাম বয়ে চলেছে। সে কোথায়, কোন সুদূরে আমি জানি নে। আমি সন্তর্পণে সেই জলধারার পাশে নীরবে কান পাতি। শুনি। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে আমার আপন অস্তিত্বকে, তার প্রবহমানতাকে গভীর মমতায় স্পর্শ করি। আমার ভালো লাগে। ভীষণ ভালো লাগে। তখন তোমার মতো যারা আমার সর্বস্ব চেয়ে আমার পাশেপাশে মাতালের মতো ঘোরে, ছেলে মানুষের মতো অবোধ আব্দারে প্রতি মুহূর্তে আমাকে উত্যক্ত করে, হাসে, কাঁদে, ছোটে, তাদের সবাইকে মনে হয়, তারা সবাই আমার এই বিরল ভালোলাগার সামান্য উপকরণ। ওরা উপলক্ষ্য। ওরা জানে না আমি কোন গূঢ় কথা শোনার জন্যে কান পেতে আছি। কোন গভীরের বাণী আমার কানে শিশিরের শব্দের মতো সারাক্ষণ বাজে আর বাজে; আর ফুলের উষ্ণতা দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে কোন অশরীরীকে আমি অনুভবে স্পর্শ করি, ওরা জানে না। তাই ওরা তোমার মতো ক্ষোভে, দুঃসহ দুঃখে আমাকে অনর্গল কলঙ্কিত করে, আমি কলঙ্কিত হই। আমার ভালো লাগে। এ ভালো লাগা কি সর্বনাশা?

শুভ। এমনি করে আর কতোদিন আমি সন্তর্পণে সেই গূঢ়, সেই গভীর নিজেকে শিশিরের শব্দের মতো সারাক্ষণ শুনবো? আর কতোদিন ফুলের উষ্ণতা দিয়ে আমি আমার বেঁচে থাকাকে এমনি করে অনুভবে স্পর্শ করবো?

ঘরে, ঘরের দেয়ালে ক্রমে রৌদ্র হাঁটছে। আমাকে বেরোতে হবে শুভ, আমি উঠি।

।। জলবিম্ব সমাপ্ত ।।